অন্ধকারের ছবি

কিন্নর রায়

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৪৬

প্রকাশিকা :

শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী

দুর্গানগর, মাদ্রাস

২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :

শ্রীগঙ্গারাম পাল

মহাবিদ্যা প্রেস

১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,

কলিকাতা-৬

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

কাছেই নরক
প্রকৃতি পাঠ
আত্মপক্ষ

ছোটদের বই

আলেকজান্ডারের বর্শা

গল্প সংকলন

রথযাত্রা
অন্যধারার গল্প

'কোথাও পাবে না কিছু ;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে ।

আমি তবু বলি :
এখন যে-কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী ক'রে যে মহা-নীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জল ঝর্ণার ধ্বনি ।'

জীবনানন্দ দাশ

পাতা মুড়িবেন না ।

রাত বাড়লে গ্যারেজে তেমন কোনো কাজ থাকে না, যদি না খুব হুড়োহুড়ি থাকে ডেলিভারি দেয়ার। তখন ওভারটাইম, মিস্তিরিদের পায়ে তেল। অথচ সকালে এখানে বাজার আর যুদ্ধের ব্যস্ততা যেন। অনেক গাড়ি—অ্যামবাসাডার, জিপ, অটো। বোর্ড অফিসের, রানীকুঠি-ওয়ারলেসের, প্রাইভেট পার্টির। ইটে গাঁথা চৌকো চারটে থামের ওপর প্রায় দোতলা সমান উঁচু। মাথায় অ্যাজবেস্টস-এর ছাউনি। ইদানীং এ বর্ষায় চাঁদনি মার্কেট থেকে স্কোয়ার ফিট হিসেবে কিনে আনা অনেকটা গড়ান মতো বেগুনি রঙের প্লাস্টিক-ত্রিপল। তার পিঠে বর্ষায় খসে পড়া কোনো নিহত-পাতা।

মেঘলা ভেঙে রোদ বেরোলে তীব্র, গা-পোড়ানো, ঘাম-জাগানিয়া। রাতে রোদ থাকে না, কিন্তু বাতাসে মিশে যাওয়া গরম থেকে যায়। গ্যারেজে ঢোকার মুখে বাঁদিকে সারি দেয়া দেয়া দোকানঘরে হার্ডওয়ার, স্যানিটারি প্লাম্বিং, তারপর মুর্শিদাবাদ, ক্যানিং, চন্দনেশ্বর থেকে আসা মানুষদের সবজির ঠেক। পিচ রাস্তার ওপারে মুদির দোকান, পাশে আর একটা তরকারির বড় আস্তানা।

সবজির ঠেকের সামনে অনেক রাত অব্দি জোরালো আলো। গ্যারেজের ভেতরে তেমন জোরের কোনো লাইট নেই। শুধু গ্যাস কাটার জ্বালার নীল আলো, ক্লাব ঘর থেকে ছিটকে আসা টি. ভি-র শাদা-কালো মাধুর্য এখানে-ওখানে, অন্ধকারে জড়িয়ে যায়।

টালির চালঅলা যুব কল্যাণ সমিতির ঘরে—যা স্থানীয় মুখে মুখে কেলাব—ক্যারামের খুট-খটাস। পাড়ার স্বীকৃত দাবা গ্র্যান্ড মাস্টারদের চাল দেয়া নিয়ে গম্ভীর আলোচনা, কখনও বা ঋষির মহিমায় 'চেক' বলে ওঠা, এসবই প্রাত্যহিক।

যুব কল্যাণ সমিতির সামনে গড়িয়ে নেমে আসা নিচু জমিতে একদা ডোবা হিসেবে থাকা জলভূমির স্মৃতিচিহ্ন। সেখানে বন-কচু ও প্রাকৃতিক

অন্ধকার।

রাত দশটা বেজে গেলে সবজির ঠেকে আলো থাকে, পটলদের রূপবতী করার জন্যে সবুজ রঙে ডোবানোর আয়োজনে। ভেতর থেকে ভেসে আসে সন্তোষ ক্যাসেট প্লেয়ারে অবিরাম 'বেদের মেয়ে জোস্না'র গান, নয়ত ডায়ালগ।—'বেদের মেয়ে জোস্না আমায় কথা দিয়েছে/ আসি আসি বলে জোস্না ফাঁকি দিয়েছে।' কিংবা 'পাহাড়িয়া সাপের খেলা···ও-ও পাহাড়িয়া সাপের খেলা।'

অন্ধকার গ্যারেজ-ঘরে একটি দুটি তিনটি গাড়ি—অ্যামবাসাডার, অটো, ডিজেল-জিপ।

শেডের নিচে, বাইরে দাঁড়ানো গাড়িদের অনেকেই অন্ধকারে ভূত। তাদের গায়ে পেয়ারা গাছের ছায়া। নিমের ছায়া, তাল গাছের লম্বাটে অন্ধকার। এসবের মধ্যেই চুপ করে বসেছিল আনসার। কাল সকালে বালিগঞ্জ যেতে হবে। তারপর রানীকুঠির ওয়ারলেস, টালিগঞ্জ সরকারি পোলট্রির অফিসে। এখন তো মাঝে মাঝেই যেতে হয়। না গেলে পার্টি ঠিক থাকে না। কাজ পেতে অসুবিধে, পেমেন্ট আটকায়।

আনসার নিজের গ্যারেজের সামনে মিন্টু অটোমোবাইলস—এই সাইনবোর্ডটির উল্টো পিঠে টিন রঙের গায়ে যে চৌকো কালিমা, তার দিকে তাকিয়ে থাকতে কোন খেয়ালে যেন বা এই গ্যারেজ-ঘরের নামটি মিন্টু অটোমোবাইলস হয়ে যায়, তা ভেবে নিতে পারে। আর ভাবনার ভেতরেই চিকন আঁধারে তার হেসে ওঠা। মৃদু।

মুসলমানী নামে কাজ পেতে অসুবিধে। যেমন হিন্দুদের পরবে—রথে, দুর্গাপুজোয় তারা কখনও একটি হিন্দুনাম নিয়ে কোলাহলে, ভিড়ে। কোনো হিন্দু-কিশোরী অথবা যুবতীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্যে। এ ঘটনাটুকু থাকেই—ইনফিরিয়ারিটি কমপ্লেকস—আমি মুসলমান, আমার সঙ্গে ওরা মিশবে না। আর বাস্তব তো তাই-ই। মানুষ হিসেবে এখনও তো সম্মান পাওয়া হয়ে ওঠে না পুরোপুরি, শুধু এই নাম পদবী অথবা জীবন-যাপনের আচার-আচরণে। বিচ্ছিন্নতা গোপনে বাড়ে। অপমানে অপমানে একজন মানুষ সত্যিকারের 'বাগি' হয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চায়। এই নাম বদলের আবরণটুকু থেকেই মিন্টু অটোমোবাইলস। সেই নামে ছাপানো প্যাড। জীবন এরকমই।

আনসার এসবই একা একা ভেবে নিতে পারে সরকারি ডিজেল

জিপের সিটে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে। লুঙ্গির কষি থেকে প্লাস্টিকের চুনোটি বের করে তামাক আর চুন আলাদা আলাদা এনে বাঁ হাতের তেলোয় ফেলে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে পিষে দিতে দিতে আনসার দেখতে পায় তার গ্যারেজে সারাই করার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িদের গায়ে সার বাঁধা জোনাকির আলোবাহার। এখানে ওখানে, একোণে ওকোণে জমে থাকা বাতিল লোহালক্কড়, ছেঁড়া পুরনো সিট, রবার, জলের বালতি, টিনের কৌটো দিয়ে তৈরি মগ, ছেঁড়া-ন্যাকড়া, আরও কতো কি হাবিজাবি। বছরের শেষে কাবারিঅলা ডেকে এসব বিক্রি-বাটার ব্যবস্থা। টাকা মন্দ হয় না। গ্যারেজের চারদিকে কোমর পর্যন্ত ইট-সিমেন্টের পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল। তারপর চাল পর্যন্ত ফাঁকা। সেখান দিয়ে দিনের বেলায় পরিষ্কার দেখা যায় কাঁঠাল বাগান, আশ-ফলের সবুজ ছায়া, কলাঝোপ, ডুমুর গাছ। ম্যালেরিয়া-লতা, তেলাকুচো-লতা, ঘাস-ফড়িং, বন-ধুঁদুলের হলুদ ফুল। এখন সেখানে সবুজ অন্ধকার লেগে আছে। একটা দুটো, অনেক আলোমগ্ন জোনাকি।

এ বাগান আমার নানার নিজের হাতে করা। তিনি ছিলেন সম্পন্ন চাষী। এসব ভাবতে ভাবতেই আনসার তার হাতের চুন-তামাক পিষে নিচের পাটির দাঁতের গোড়ায় রাখার নেশা-দ্রব্যটি তৈরির চেষ্টা করতে পারে। বাঁ চেটোর ওপর ডান হাতের আঙুলে ফটফট তালি বাজিয়ে বাড়তি চুন আর তামাকের ধুলো উড়িয়ে সে খৈনিটি তৈরি করে নেয়। তারপর চিমটি ধরে সেটিকে জায়গা মতো দেয়া। জিভ দিয়ে সরিয়ে কষ দাঁতের পাশে। অনেকের মতো তলার ঠোঁটের নিচে নয়।

লালায় চুন-তামাকের মিশ্রণ মিশে গেলে নেশার আমেজ। তখন থুথু ফেলা ছাড়া আনসারের আর কিছু করার থাকে না। সেজভাই আক্রাম সাইকেলে কামালগাজি চলে গেছে। আসবে কাল ভোরে। এমন প্রায় রোজই চলে যায়। আবার ভোরে আসে। গাড়ির নিচে শুয়ে, পুরো শরীর ঢুকিয়ে আক্রাম সারাই করতে করতে কখনও বা অ্যাই দিলীপ, দশ নম্বরটা দে, বারো নম্বরটা কোথায় গেল! এ সব বলতে বলতে তেল-কালি মেখে ওঠে। দশ নম্বর, বারো নম্বর বিভিন্ন মাপের স্ক্রু টাইট দেয়া রেঞ্চ-এর নাম।

তার কোনো মাইনে নেই। কিছু হাতখরচ, সিনেমা, বিড়ি-খৈনির পয়সা, একবেলা মাসুদের দোকানে গোস্-ভাত। মাসকাবারি বিল

পাতা মুড়িবেন না।

পেমেন্ট। সেখানে মুর্শিদাবাদের অনেক লোক খায়। ক্যানিং, চন্দনেশ্বরের মানুষেরাও। আরও কেউ কেউ।

এসব ভাবতে ভাবতে আনসার গ্যারেজের ছায়ার বাইরে। আকাশে মেঘ নেই। অজস্র তারা। আমাদের ছেলেবেলায়ও কি ব্রহ্মপুরের আকাশ এরকম ছিল, নাকি আরও ঝকঝকে!

পিচ রাস্তায় খৈনির থুথু ফেলে আনসার বুঝতে পারল তার পেচ্ছাপ পাচ্ছে। পুব মুখে বসে জলে বিয়োগ সারল আনসার। ইদানীং বছর দুই সে এসব মানছে। পশ্চিম ছাড়া যে কোনো দিকে মুখ করে পেচ্ছাপ সারা যায়। বসে করতে হবে, সঙ্গে ঢিল বা জল। পাঁচ ওয়াক্ত তার কোনো দিনই হয় না। শুধু শুক্রবার শুক্রবার জুম্মা-পড়া। বেলা এগারোটা থেকেই গা-ধুয়ে—গোসল করে তৈরি হওয়া।

এখন অবশ্য জল নিয়ে বসা হলো না আনসারের। ঘাস, ঘাসফুলের গায়ে তলপেট হালকা করতে করতে আনসার আরও একবার ক্লাব থেকে চলকে আসা টিউব-জ্যোৎস্না দেখতে পেল।

ইদানীং নামাজ, ধর্মীয় নানা রীতকরণে মন দিয়ে আনসার তার মদ্য-পানের বদ-অভ্যাসটি অনেকটা কমাতে পেরেছে। তবু কখনও সখনও—তেমন পাল্লায় পড়লে।

গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আনসারের মনে পড়ল মা ন' ভাই লিয়াকতকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়েছে—টাকা দরকার। আমি আর কত পারব! বড় ভাই বিয়ে-শাদি করে কবেই আলাদা। নিজের সংসার সামলাতেই ব্যস্ত। দুটো বাচ্চা, ভাবি। চাষের কাজ করে। নিজেরই কুলোয় না। ছ' ভাই চার বোনের মধ্যে আমি মেজো। ছেলেবেলা থেকেই এই ব্রহ্মপুরে—মামার বাড়ি। কামালগাজি আমার কাছে দূর বিদেশ।

আব্বা—বাবা তো তবলিগ-জামাত, আল্লা-চিন্তায়, বেহস্ত-এর রাস্তা পাকা করার ভাবনায় সংসারে থেকেও নেই। আজ এ মসজিদ কাল ও মসজিদ—তবলিগি প্রচারে। আজ এ মহল্লায় কাল ও মহল্লায়।

মাঝে মাঝে আমরা ভাই-বোনেরা হয়েছি। মাথায় বেড়েছি। বাবা এসব ভাবে নি। অর্থ রোজগারের কথা ভাবে নি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ডিসিপ্লিনে তার পায়ের পাতার কড়া, সিজদায় সিজদায়—ক্রমাগত প্রণামে কপালে কালো দাগ। মুঠ ভর তবলিগি দাড়ি। ছোট করে ছাঁটা চুল,

যাতে টুপির বাইরে না যায়। গোঁফের চুল যাতে না জলে পড়ে। প্রতি বছর নিয়ম করে রোজা—ইসলামী আরও নানা নিতকিত। শুধু আমরাই তেমন করে স্কুলে পড়তে পারলাম না। আমি, আক্রাম—দু'জনেই ঐ ক্লাস ফাইভ/সিক্স পর্যন্ত। কায়দা করে ইংরেজিতে নাম সই করতে পারি। ক্লাস এইট পাশের সার্টিফিকেট আছে। ওটা অনেক কাজে লাগে। আক্রামেরও।

বড়দা বলতে গেলে আনপড়ই। ঐ এক আধ লাইন চিঠি লিখতে পারে বাংলায়। সামান্য আরবি জানে। বোনেরা মসজিদে আরবি পড়েছে।ঐ কোরাণ শরিফ পড়ার মতো। একটু আধটু। কিন্তু পৃথিবীর দরজা যে অনেক বড়। এখন বুঝতে পারি। পার্টিকে কাজের কোনো টেণ্ডার বা বিল দেয়ার সময়, অথবা ব্যাঙ্কে চেক সই করে জমা দিতে গেলে নিজেকে ইংরেজি না জানা পাথর মনে হয়। অপমান বাজে। অনেক কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না, বলতে, বোঝাতে পারিনা। এখানে আমার বয়েসীরা প্রায় সবাই এরকম। অথচ বাবা যদি গোল টুপি, লম্বা টুপি, দাড়ির মাপ না করে আমাদের লেখা-পড়ায় একটু জোর দিত। আর জমি ছাড়া বাবারও তো কোনো নিয়মিত রোজগার নেই। তাও সেভাবে দেখতে পারে কই! আমাকে প্রতি মাসে আশি কিলো চাল কিনে পাঠাতে হয়। এখন তো একটু ভদ্র চালের দর ছ'টাকা। ছ'টাকা কুড়ি। আশি কিলো চালে বড় জোর দিন কুড়ি/বাইশ। আমাদের বাড়ি রুটির পাট নেই। দু'বেলা ভাত। জলখাবারও ভাত। কাঠের জ্বালে মা দিনরাত রান্না করে, ঘাম মোছে। খেতে দেয়। বাসন মাজে। জল তোলে। নানা কারণে অপমানিত হয়। আমি করি, অন্য ভাই-বোনেরা করে। বাবা, দাদা, ভাবিও।

মায়ের বাংলা অক্ষরজ্ঞান নেই। মায়ের নামে বড়দার হাতের লেখা—'চাল তাড়াতাড়ি পাঠাইও। আর পারিলে কিছু নগদ, আমার হাতখালি। তোমার আব্বা বাড়ি নাই…'

কোথা থেকে এত সব পাই! এই তো রমজান মাসে রোজার ঈদের সময় বাড়ি গিয়ে আব্বা, মা, সব ভাই-বোন, দাদা-ভাবি, দাদার দুই ছেলে, চাচ্‌তো ভাই-বোন, চাচি—সবাইকে জামা-কাপড় কিনে দিলাম। সেও তো দু/আড়াই হাজারের ধাক্কা গেল। এ সব তো সামলাতে হচ্ছে। আর গ্যারেজের মরা সিজনে হাত একদম খালি। নিজের লাল রয়্যাল

এনফিল্ডে ঠিক মতো তেল অব্দি ভরতে পারি না। ভাবছি বেচে দেব এবার রয়্যাল এনফিল্ড। ফুটুনির দরকার নেই। তার চেয়ে রাজাবাজার, গাড়িয়া, হাজরা থেকে মাল আনার জন্যে বাজাজ-সুপার সবচেয়ে কেজো-গাড়ি।

'মটকা'—মাথা প্রায় সব সময়েই গরম থাকে। যাকে তাকে যা-তা বলে দি। সংসার, বিবি-বাচ্চা ফেলে এত আল্লা আল্লা করলি হয়!

মাসের চাল অটোয় বসিয়ে নিয়ে যায় আক্রাম। সে ভাড়াও আমায় দিতে হয়। এ সব ভাবতে ভাবতে দাঁতের নিচের পাটি আর ঠোঁটের ফাঁকে জিভ দিয়ে ভিজে খৈনিটা এনে বের করে পিচ রাস্তায় আছড়ে দেয় আনসার। বাঁ হাতের প্লাস্টিক বডি টাইটান কোয়ার্জে প্রায় সাড়ে দশটা। একলা থাকলে দুশ্চিন্তা আসে। আর মশা।

আনসার এখন মামাবাড়ি গিয়ে খাবে। কোনো কোনো দিন বাইরেও খেয়ে নেয়। যেদিন নাইট শোয়ে সিনেমা দেখা থাকে। অথবা খুচরো মহেফিল।

মামাবাড়ির জমিতেই আনসারের মিষ্টু অটোমোবাইলস। এটুকু তার নামে কয়েক মাস লেখাপড়া হয়েছে।

সেই লেখাপড়া নিয়েও বড় খালা, মেজো খালা, খালাতো ভাইরা, খালুরা মামাকে কম হেনস্থা করে নি। নানির কম অশান্তি যায় নি। মামা-মামিরও। মামা এরশাদ ব্যাঙ্কে চাকরি করে। দুই মেয়ে।

নানির বাতের ব্যথায় কষ্ট। ভারি মানুষ। সঙ্গে লো-প্রেসার আছে। মাথা ঘোরে।

খাবার ঢাকা থাকে। ঢাকা খুলে নেয়া। কোনো কোনো দিন মামি জেগে থাকলে নিজে হাতে। খাওয়া শেষ করে অনেকটা দূরে শুতে যাবে আনসার। এমনই হয়ে আসছে মামার বিয়ের পর থেকে। আসলে নানির ঘরেও এখন আর শোয়া যায় না। খালা—মাসিদের কোনো একজন, মাসির মেয়েরা এলে তখন অন্য কোথাও শোয়ার জায়গা দেখ। একতলায় তো তিনটে ঘর। মামার বিয়ের পর আনসারের পাশের ঘরে শোয়ার পাট চোকে। তখন তার আঠারো কুড়ি।

গৃহ-পরিবর্তন বিপ্লবটি এভাবে ঘটে। জওয়ান ছেলে, সেয়ানা ভাগ্নে পাশের ঘরে থাকবে কিনা, তা নিয়ে মামা বিয়ের আগেই কিছু চাপা গুঞ্জন তোলে। তখনও নানা বেঁচে। নানি তার অন্ধ-স্নেহে—যতটা

নিজের মেয়ের ছেলেকে দেখা যায়। বোধহয় এর থেকেও কিছু বেশি পরিমাণে আনসারকে দিয়ে ফেলে। অথচ তার পুত্রও একটি। দুইয়ের টানা-পোড়েন চলতে চলতেই এরশাদের বিয়ে হয়ে যায়।

মামা-মামি একতলার যে নতুন ঘরটিতে শুতে থাকে, তার পাশেই আনসারের একটি চৌকি পাতা কামরা। এরশাদ আলি মণ্ডল ও রেহানা-বিবি পাশের ঘরেই একটি একলা পুরুষ-যৌবনকে মেনে নিতে পারে না। দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে অশান্তি ঘনায়। বেড়ে ওঠে।

এরশাদ একদিন সত্যি সত্যি রেহানা ও ভি. আই. পি. সুটকেস নিয়ে টালিগঞ্জে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওঠে। সে ঘর ভাড়া নেবে। আলাদা থাকবে।

আনসারের বিপন্নতা বাড়ে। একজন নিরুপায় মানুষ হিসেবে বুঝতে পারে অন্ধ স্নেহ নাতির থেকে একমাত্র পুত্রকে অনেক বেশি বাঁধে। সে আরও বেশি জেদবাদ করলে। এবাড়ি থেকেই তাকে চলে যেতে হবে। তার চেয়ে মামা-মামি ফিরে আসুক। আমি যাই।

আর এই জ্ঞান-বুদ্ধিটুকু নিয়েই আনসার পৌঁছে যেতে পারে টালিগঞ্জে। তার মামার শ্বশুরবাড়ি। মামা তখনও অফিস থেকে ফেরে নি। সে মামিকে জানিয়ে দিয়ে আসে—আমি চলে যাচ্ছি। রাতে অন্য কোথাও শোব।

এর পরের পর্বটুকু গতানুগতিক। মামা-মামি ফিরে আসে। নানি আর নানার মুখে হাসি। সব শান্তিকল্যাণ।

এরশাদ তাকে রাতে ডেকে বোঝায়, যা ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার হয়ে গেছে। কেন সে রাতে এ বাড়ি শোবে না! সে তো তাদের ভাগ্নে। আনসার প্রথমে কথা বলে না, তারপর গাঁইগুঁই করে দু'চার দিন প্রবল অস্বস্তি নিয়ে সেই ঘরে একলা শোয়। ঘুম আসে না।

তারপর আবার কয়েকদিন সে এবাড়ি-ওবাড়ি, দোকানঘর, গরমের দিনে ফাঁকা বারান্দা করতে থাকে। যেমন এখানে ক্যানিং, মুর্শিদাবাদ থেকে আসা অনেক মানুষ। তারা কেউ মিস্তিরি, কেউ যোগাড়ে, কেউবা ফিরিঅলা। ঘর ভাড়ার সামর্থ্য অথবা ইচ্ছে নেই। তাই কোনো বারান্দায় মশারি টাঙিয়ে। অথবা বন্ধ দোকান ঘরের সামনের ফালিটিতে। মাথার ওপর ছাদটুকু, না থাকলে আকাশই। ছাগলের নাদি পরিষ্কার করে, বিছানা পেতে ঘুমে। এদের কয়েকজন অবশ্য ভাড়া ঘরে। তবে

বেশির ভাগই রাস্তার ধারে।

এ ঘরে রাতে শোয়া নিয়ে 'আল্লার কিরে' পড়ল মামির জেদা-জেদিতে।

আনসারি চুপ করে রাতের খাওয়া খেয়ে নিচ্ছিল, রান্নাঘরে বসে। বারান্দায় তখন ডুমের ফ্যাকাশে আলো। সবে শীত গিয়ে রাত বড় হয়েছে। তাও এগারোটা হবে। রেহনা পাখির পায়ে সিমেন্ট বাঁধানো বারান্দায় এসে নিচু গলায় আনসারের কাছে চাবি চায়।

আনসার সেদিন ব্যাপারটি ঝেড়ে ফেলতে পারে।

তারপর আরও একদিন এমনই কণ্ঠস্বরে খেতে বসা আনসার একটু চমকে তার নতুন বিয়ে হওয়া মামিকে দেখে নেয়। মাথায় কাপড় নেই। কপালে বিন্দি। ফর্সা, তেমন লম্বা নয়। শরীরে স্বাস্থ্যের আলো আছে। —ভাগ্না চাবিটা দাও।

গ্রিলগেটের চাবি খুলে নিভৃতে, একা একা রাতের খাওয়া সেরে সে চলে যাবে এমনটি ভেবেছিল। বাতের ব্যথা, লো প্রেসার নিয়ে নানি তার ঘরে ঘুমে।

ভাগ্না, চাবি দাও—এই মন্দ্র, স্থির কণ্ঠস্বরে আমি, আনসার আলি মণ্ডল কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ি। চাবিটির জন্যে এ আকুলতা, প্রতীক্ষা আনসারকে ঘর নামে এক আরশিনগরের কথা স্মরণ করায়। যেখানে অবিরাম মায়ার খেলা। বাইরে গরম আছে। আকাশ লাল, মেঘে মেঘে। হয়ত বৃষ্টি এলো বলে। বাঁ হাতের কব্জির দিকে ডায়াল করে পরা টাইটান কোয়ার্জে রাত এগারোটা। মামি রেহনাবিবির পেছনে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলোয় মাথা টানা বারান্দা। তারপর অন্ধকার ঘরের চৌকো ফ্রেমে প্রায় মুছে যাওয়া এরশাদ আলি মণ্ডল স্থির কোনো চিত্রের মহিমা নিয়ে।

আনসার পেটে খিদে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রান্নাঘরের পাশের ঘরে চৌকির ওপর স্টিলের বড় কাঁসিতে তার জন্যে ভাত। উচ্ছে-আলু-চিংড়ি মাছ দিয়ে রাঁধা তরকারি, আলু আর মাছ দিয়ে ঝোল। তেষ্টা পেলে গেলাসে নয়, বাটিতেই জল গড়িয়ে অন্ধকারে নয়তো আলোয় খেয়ে নেবে। সেই পানে শব্দ আছে। আনসার মামির দিকে তাকাতে পারছিল না। কিংবা সোজা হয়ে তাকানো যাচ্ছিল না। নারীর এ শাসনে ঘর-বাড়ির বাতাস থাকে। হয়ত বা সুস্থির, নিরালা গৃহকোণের ঘ্রাণ।

বাঘবন্দী আনসার খিদে ভুলছিল, তৃষ্ণাও। দালানের কোণে ডেকে ওঠা টিকটিকির ঠিক ঠিক-এ সামান্য কেঁপে সে আবারও রেহনাবিবিকে দেখল। মাকে আমি কতদিন দেখি না। যাওয়া হয় না কামালগাজি বহু দিন। হয়ত এক মাসই হবে। গ্যারেজে এখন ভর্তি কাজ। মাথা তোলার সময় নেই। বডি, হুড, ইঞ্জিন—সব নতুন করে বানিয়ে তোলা। ইলেকট্রিক মোটর চালিয়ে চালিয়ে লোহার লম্বা পাতের আর্থটি বসিয়ে নীল আলো আর ধাতু খণ্ডের ম্যাজিকে জুড়ে নেয়া বডির নানা অংশ। ইলেকট্রিক স্প্রেয়ার-এ ছেটানো রং—গাড়ি নতুন হয়ে ওঠে। একটা অ্যামবাসাডারের বডি রং করলে পার্টির কাছ থেকে পাওয়া যায় চার হাজার। একটা স্কুটার রং করলে সাতশো।

চাবিটা—রেহনা আবার আদেশে ফিরল। আর অন্ধকার ভেঙে বেরিয়ে আসা এরশাদ বলল, কেন হুজ্জত করছিস বাবা! দিয়ে দে না তোর মামিকে, আজ এখানেই শো। মামার গলায় আর্তি ছিল।

বাইরে উঠোনে কাঁঠাল পাতার ওপর বৃষ্টি পড়ল। পুরু পাতার ওপর জল পতন ধ্বনি এক অন্য আবহ তৈরি করে দিতে পারে। আনসার না বলে না। শুধু না-বাচক শব্দটি খুব জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে। তারপর ছুটে, গ্রিল খুলে, এরশাদের বাজাজ-চেতক, কাঁঠাল গাছ, মোটা পাঁকাটির বেড়া দেয়া মুরগি-মা আর বাচ্চাদের অন্ধকার খোঁয়াড়, উঠোনের মাটি খুঁড়ে জ্বালানো যায়—এখন নেভা-পাঁকাটি, পাতাপুতি, কাঠের কালি লাগা, লোহার শিকছাড়া উনোন পেরিয়ে পেরিয়ে জোরে ছুট লাগায়।

এক সেকেণ্ডও নয়। বাঁ দিকে একবার মোড় নিলেই গ্রিলের গেট পাওয়া হয়ে যায়। তার পরই স্কুটার তোলার ঢালটুকু পেরিয়ে ইট বেছানো পথ। উল্টো দিকে আর এক নানার গোয়াল, সিমেন্ট বাঁধানো অগভীর, সরু নর্দমা, ফলবতী ডুমুর গাছ। আর বাঁ দিকে মোড় নিলেই জাকিরের ইট-বালি-সিমেন্টের গোলা। সেখানে এখন স্তূপকরা স্টোনচিপ, বালি, পাঁজা ধরা ইট। তারও পরে ক্যানিং মুর্শিদাবাদী তরকারি-অলাদের আলো। এটুকু পেরোতে প্যারলেই মিণ্টু অটোমোবাইলস।

জোরে, বৃষ্টি পড়ছে। তার শব্দে, শীতলতায়, ধারাপাতে গ্রীষ্ম-মুক্তির আয়োজন। লুঙ্গি আর হাফহাতা শার্ট পরা আনসার এই আলোটুকু পেরিয়ে খুব সহজেই গ্যারেজের অন্ধকারে মিশে যায়। বুড়ো,

আধবুড়ো গাড়িরা নবীন হয়ে ওঠার প্রতীক্ষায়। নতুন রঙে, ইঞ্জিন অথবা বডি রিপেয়ারিং নামের কায়াকল্পে নবজীবনে প্রবেশ করানোর সূত্রে।

অ্যাজবেস্টসের চালে বৃষ্টির পতনধ্বনি কেমন যেন ভোঁতা—কানে বাজে। যুব কল্যাণ সমিতির দরজা বন্ধ। আরও দূরে সবুজ, ছায়ালো অন্ধকারে যে বৃষ্টি পড়ে যায়, তার শব্দে কেমন যেন মাদকতা—আনসার এ সব কিছুই শুনতে পায় না। শুধু হাওয়ার টানে উড়ে আসা জলের গুঁড়ো তার শরীরে ক্রমাগত বিঁধে যেতে থাকে। গায়ে উড়ে লাগে বুড়ো পাতা। পেটের ভেতর মোচড় মারে খিদে।

আর একটু বৃষ্টি কমে এলে আনসার তার কাছে সারাতে আসা গাড়িদের ছেড়ে তরকারির ঠেকে আসে। সেখানে তখনও আলো। দুটো দুশো পাওয়ারের ল্যাম্প বাঁশের মাথায়। সকালের খালি ঝুড়িরা সবজি ভর্তি হয়ে চালানোর প্রতীক্ষায়। দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধা, পাতা মোড়া শশার ঝুড়ি থেকে গোটা চারেক শশা বের করে আনসার। শশার ঝুড়ির পাশে চিচিঙে, ভিণ্ডি, কাঁকরোল—সবাই কলাপাতা মোড়া, দড়ি-বাঁধা, ঝাঁকা-বন্দী।

বৃষ্টি কমে এলো। সারা দিনের ট্রিপ শেষ করে রবিয়ুলের গাড়ি ফিরছে পাড়ায়। তার আলোটুকু বর্ষার রাস্তার এমন নির্জনতা সহজেই কাটিয়ে দিতে পারে। আর এ আলোয় স্বাস্থ্যবান, পুরুষ্টু ব্যাঙকে লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে রাস্তা পেরোতো দেখে আনসার।

বৃষ্টিতে যেটুকু ধোয়া হয়েছিল সেটুকুতেই যথেষ্ট। কাঁচা শশা চিবিয়ে খেলে খিদেয় প্রলেপ পড়ে। আমার নানার জমিতে তরকারির ঠেক—এই সুবাদে আমি শশা নিয়ে থাকি—এমন যুক্তিতে আরও দুটো শশা ঝুড়ি থেকে বের করে নেয় আনসার। তাকে কেউ বলার নেই। পাতা, রঙিন প্লাস্টিকের ত্রিপল মোড়া ঝুড়ির পাশে লম্বা তালগাছে পেকে উঠব উঠব বলে ঝুলে থাকা তালেরা এই বৃষ্টিতে ভিজে আরও কালো, গম্ভীর। বৃক্ষের ছায়াটি আলোর বুকে বড় অবলীলায় ভেঙে, শুয়ে থাকে।

গোটা ছয়েক শশায় খিদের মাথায় ধুলো পড়া। আপাতত এটকু প্রলেপই যথেষ্ট! কাদা বাঁচিয়ে আনসার পিচ রাস্তায় উঠে আসে। এখান থেকে পশ্চিমে মুখ করে তাকালে ইটের পাঁচিল। ডান দিকে বাদামতলা.

পাকা মসজিদ। তারপর কবরখানা। সাহেবা, আস্পিয়ারের চা-দোকান, ইয়াসিনের সাইকেল সারানো, চাকায় পাম্প দেয়া, ইসলামের দোকান না হওয়া কাঠের বন্ধ গুমটি, জালালের জ্বালানী কাঠ, সবার ঝাঁপই পড়ে গেছে। আজ আর বৃষ্টির জন্যে মসজিদের উল্টো দিকে, হ্যালোজেনের নিচে তাসের আড্ডা বসে নি। রাস্তার ওপারে কমার্শিয়াল কলেজ, বাপ্পা স্টোর্স, নাশিম বস্ত্রালয় তেমনই অন্ধকার।

এ রাস্তাটুকু পেরিয়ে ডাইনে বাঁক নিলে মসজিদের ফালি পুকুর। তারও পরে বাঁ দিকে আর একটি তুলনায় সামান্য বড় জলাশয়। তারপরে কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে সে আসগরদের গ্রিলের সামনে দাঁড়ায়। চাবি দিয়ে বাইরের তালা খোলে। বৃষ্টিতে মাথার চুল যেটুকু ভিজেছে তা মোছার জন্যে অন্ধকারেই তারে ঝোলানো গামছার দিকে হাত বাড়ায়। না পেয়ে খিস্তিটুকু করে ওঠার ফাঁকে অভ্যাসে হাত বাড়িয়ে সে তারে ঝোলানো গামছা ছুঁয়ে ফেলতে পারে। আর তারপরই সুইচ টিপে আলো জেবলে মাথার ঘন চুল শুকনো করে মুছে নিতে নিতে আনসার বাইরে যে দূর-অন্ধকার, তার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাসটি চেপে, আলো নিভিয়ে, দড়িতে গামছা রেখে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে আসে।

আর এই ঘরের খাটে আসগর শুয়ে—এটুকু আলো জেবলে সে দেখতে পায়। ফ্যান বন্ধ। বৃষ্টিতে শীত পেয়েছে, তাই আসগরের গায়ে পাতলা কাঁথা। হাঁটু দুটো মুড়ে প্রায় বুকের কাছে। এ পর্যন্ত দেখেই ঘরের দেয়ালে চৌকো আয়নায় নিজেকে ভেসে উঠতে দেখে আনসার। পকেট-চিরুনি বের করে মাথা আঁচড়ায়। তারপর গায়ের জামাটি খুলে খাটের বাজুতে ঝুলিয়ে সে চিত হয়ে, পা টান করে শোয়। তার আগে অভ্যাসে আলো নিভিয়ে দেয়।

আসলে গ্যারেজে এখন অনেক কাজ। রানীকুঠি-পুলিশ ওয়ারলেসের এম. টি. ও সিংসাহেব খুব কড়া। সময় মতো গাড়ি না পেলে ধাতাবে। আবার কাজ করাবে আমাকে দিয়েই। বডি, রং, ইঞ্জিন। কাজ শেষ হলেই ম্যাকডোয়েলের বোতল। ইসলামে শরাব, সুদ নেয়া হারাম। এত সব জেনেও আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। মাঝে মাঝে গোলমাল করে ফেলি। ব্যাঙ্কে আমার টাকা আছে। ইন্টারেস্ট পাই। আমার আব্বা তবলিগের লোক। ভীষণ মানেন জায়েজ, না-জায়েজ। উনি ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন না।

কবে যেন স্কুলে পড়তাম। স্কুলের নাম বরদাপ্রসাদ হাইস্কুল। সেখানে পরপর ফেল করা। স্কুল পালানো। বড় ছুরি নিয়ে গাছতলায়, ছায়ায়, গরমে বড় তরমুজ কেটে খাওয়া। পড়া হবে না। ফেল করি। সবাই অপমান করে। টাকা পেতে ভালো লাগে। এসব ভাবতে ভাবতে মোটর গ্যারেজে কাজ শিখতে ঢোকা। কামাই, কাজে ভুল হলে বড় মিস্তিরির কাছে চড়-চাপড়। কাজ করতে করতে আমার ঘুম আসত। তারপর আস্তে আস্তে মামার জমিতে আমি থিতু হলাম। খালা—মাসিদের সঙ্গে ঝগড়া করে মামা তার ভদ্রাসনের মুখপাতটুকু আমায় দিলে। সেখানেই মিন্টু অটোমোবাইলস।

তারও আগে, স্কুল পালিয়ে বেলফুল তোলা। আমার নানার জমিতে ফুল চাষ। ফাল্গুন/চৈত্রের ভোর থেকেই। ভোর থেকে বাচ্চাদের পয়সা রোজগারের জন্যে ফুল তোলার হুড়োহুড়ি। সকালে একবার, দুপুরে একবার—দিনে দুবার তুলছি। রোজ আট / দশ কিলো। তা নিয়ে হাওড়ার হাটে। জল দিলে ওজন বাড়ে। দশ কিলোকে বারো করে দেয়া কিছু নয়। কিছু তুলি, কিছু কিনি। আট টাকা কিলো কিনে দশ টাকায় বিক্রি। পকেটে রোজই লাভের নোট।

এটুকু ভেবে নিয়ে আনসার কাত হয়ে যেতে পারে। তারপর ভাবনাটুকু জোড়া লাগিয়ে সে বেলফুলের বিশাল জমিটি দেখতে পায়। একপাশে চিচিঙ্গার চাষ। তার সবুজ লতায় রাতে অন্ধকার আটকে গেলে তার ওপর জোনাকি এসে বসে। চাঁদের আলোয় কালচে-সবুজ পাতার ফাঁকে ফুটে থাকা বেলফুলে আমোদিত বাতাস। অথবা আনসার যেন এই মাঠে এক নবীন নক্ষত্রমালা আবিষ্কার করে নিতে পারে। পাশে ঘাটলা ভাঙা বিশাল পুকুর চৈত্রে অথবা বৈশাখে হাঁ-মুখ মেলে শুয়ে থাকে। বর্ষায় ভরে উঠলে, জল যদি ঘাটলা ছুঁয়ে যায়, তখনও—আষাঢ়-শ্রাবণে এমনই আমোদিত বেলফুল বাগান।

নানাদের ভাগ হওয়ার পর সে বাগান বিক্রি করে গেছে। এখন কেটে সাফ করে বহুতল গড়ে ওঠার প্রতীক্ষায়। ফ্ল্যাট বাড়ি আমাদের উঠোনে ঢুকে পড়েছে। এরপর আমরা কোথায় যাব? আরও পেছনে! কত পেছনে? সোনারপুর, ক্যানিং, পৈলান, খড়িবেড়ে, ভাসা, আমতলা? সেখানেও তো জমির দাম বাড়ছে!

আমি জানি পেট্রোল গাড়িতে কারবোরেটর তেলকে নিয়ে গ্যাস

তৈরি করে। ডিজেল গাড়িতে কারবোরেটর থাকে না, সেখানে ফুয়েল পাম্প। স্পার্ক প্লাগ, কয়েল, ব্যাটারি—এ নিয়ে ইঞ্জিন সাইড। গিয়ার বক্স। ডিস্ট্রিবিউটর পয়েন্ট থেকে কয়েলে কারেন্ট এল। তারপর—এসব আমার রাত জেগে, দিন জেগে, মার খেয়ে, খিস্তি খেয়ে শিখতে হয়েছে।

এখন আমি গাড়ি ধরেই, পাকা ডাক্তার যেভাবে রোগী দেখেই বলে দিতে পারে অনেকটা—অনেক কিছু বলতে পারি। রেডিয়েটর, কারবোরেটর, গিয়ার বক্স টাই রড, স্টিয়ারিং আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। অসুখের কথা বলে।

জানা আছে অ্যামবাসাডার, জিপ চার সিলিন্ডারের গাড়ি। মার্সিডিজ, ডজ ছ সিলিন্ডার। নিশানও তাই। পুরেনো মরিস চার সিলিণ্ডার। আবার ফিয়েট, মারুতি তিন সিলিন্ডার। বাজাজ স্কুটার ১০০ সিসি। এনফিল্ড সেখানে সাড়ে তিনশো। এ গাড়ি স্টার্ট করতে ব্যাটারি লাগে।

যে কোনো গাড়ি চালাতে পারি। নিজের লাল এনফিল্ড-এ ঝড় তুলে যে কোনো ফাঁক দিয়ে কাটিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার হিম্মত আমার আছে। তবু গরমে আমার ঘুম আসে না। শৈশব, বেলফুল-সুঘ্রাণ কখনও মন খারাপ করে দেয়। রঙের গন্ধ, ডিজেল-মবিলের গন্ধ, গ্রিজ, বডি লোহা-শিরীষ কাগজে ঘষে ঘষে সমান করতে গিয়ে উড়ে যাওয়া শুকনো রং—আমি ডুবে যেতে থাকি।

বাইরে আবার বৃষ্টির শব্দ। ব্যাঙের ডাক। আর এটুকু ঠান্ডায়, আরামে, ঘুমের নিজস্ব—ব্যক্তিগত স্বস্তির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে আনসার এক স্বপ্ন বানিয়ে নিতে পারে। বিস্তীর্ণ, চাঁদের আলো লাগা বেলফুল ক্ষেতের মধ্যে সে একলা। চারপাশে অজস্র ফোটা ফুল, সুঘ্রাণ, তাকে লক্ষ করে ছুটে আসা একটি জোঙ্গা-জিপ। সবুজ বনেট অন্ধকারে কালো হয়ে উঠেই জ্যোৎস্নায় সবুজ পেয়ে যায়। আনসার ছুটতে ছুটতে সেই গাড়ির নাগালের বাইরে চলে যেতে চায়। আর সেই অতিকায় জোঙ্গা ক্রমশ আর বড় হয়ে উঠতে উঠতে এক সময় যেন বা প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথ হয়ে ওঠে। তার চাকার নিচে মথিত, দলিত গাছ-পাতা-ফুল। গাড়ি প্রায় আনসারকে ধরে ফেলে ফেলে। তখনই ঘুম যায় ভেঙে।

সে উঠে পড়তে গিয়ে তার ঘাম ভেজা শরীর টের পায়। মাথার ওপর ফ্যান চলে না। ঘরের মালিক আসগার বন্ধ করে শুয়েছে। তাই চালানোর কোনো উপায় থাকে না।

আনসার বিছানা ছেড়ে বাইরে আসে। এবার অন্ধকারেই গামছাটি পেড়ে নেয়। গলা, মুখ, পা, বুক, বগল, হাত মোছে। তারপর ঘরে এসে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ঘামে ভেজা বালিশের পিঠটা উল্টে দিয়ে নিজের মাথা রেখে চিত হয়। ঘুম ডাকে।

দুই

সকালে অন্য গ্যারেজ যেমন থাকে তেমনিই মিণ্টু অটোমোবাইলসও— ব্যাস্ততায়, ঠেকাঠুকিতে—শব্দে।—অ্যাই, চা আনরে। চাতালটা আন, রেঞ্চ দে, হুইল-রেঞ্চ দে, জক—জ্যাক দে, বাতি দে, কোনটা আন— হাম্বার মার, বল বেয়ারিং ঠিক কর, গ্রিজ লাগা।

কাল রাতে বৃষ্টি হলেও আজ তীক্ষ্ণ রোদে গরম বেড়েছে। আনসার তালু পিটিয়ে পিটিয়ে চুন-তামাকের বাড়তি ধুলো উড়িয়ে দিতে দিতে দেখতে পেল তরকারির ঠেকের গা বেয়ে ওঠা ফেউটি। তার ঝকঝকে চামড়ায় রোদ পড়েছে। কালো পিঁপড়ের সারি শাদা ডিম মুখে নিয়ে দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠছে। তার মানে আবার ঢালবে। প্রায় এক বিঘত শরীর নিয়ে বুকে হাঁটা ফেউটি তার ল্যাজ আর পায়ের ভারসাম্যে পিঁপড়েদের খাবার হিসেবে পেতে চাইছিল।

গ্যারেজের দক্ষিণে পেয়ারা গাছ, ঘুঁটে ঢাকা দেয়ালে আলো লাগে না। টিউবয়েল, চৌবাচ্চা, সিমেন্ট বাঁধানো কলতলা পেরোলে যে উঠোন, তার ডানপাশে রান্নাশাল। এখন সেখানে গেলে দেখা যাবে আনসারের নানি আঁচলের কাপড়ে মাথা ঢেকে কাটারিতে কাঠ কাটছে। রান্নাশাল থেকে ধোঁয়া আসছে কাঠের। রেহনাবিবি রান্না চাপিয়েছে। তার তো কেরোসিন-স্টোভও আছে। তবু প্রথাগত কাঠের জ্বালে রান্না এখনও অভ্যাসে। তার নীলচে ধোঁয়াটুকু বাতাসে ধীরে মিশছিল।

—অ্যাই ফরিদ, জল দে, জল দে। বড় মিস্তিরিদাকে চা এনে দে। সারাক্ষণই নিজের গ্যারেজের বাচ্চাদের এমন তাড়ার মধ্যে রাখতে পারে

আনসার। তার কালি-তেলমাখা ফুলপ্যান্ট, গায়ের মোটা কাপড়ের শার্ট সবই অন্যান্যদের মতোই। আর সিমেন্ট বাঁধানো গলিপথ, টিউবওয়েল পেরিয়ে গেলেই তার জলখাবার পাওয়া হয়ে যায়। এটুকু যেতেই কুঁড়েমি আটকায়, সংকোচ ঘিরে আসে।

—অ্যাই ফরিদ, আস্পিয়ারের দোকান থেকে আমায় দুটো পরোটা এনে দে তো—এটুকু বলেই সে নিজের মতো খৈনিটুকু গালে ফেলে দেয়। আর জিভ দিয়ে যথাস্থানে রাখতে রাখতে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে ওঠা উচ্চারণে বলে, কাঁচা পিঁয়াজ আনবি। আর একটা লঙ্কা।

ফরিদ কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। সে পাখি হয়ে এদিক ওদিক নেচে বেড়াতে বেড়াতে কাজ গুছোতে থাকে। দশ/বারো বছরে কত আর মন বসে কাজে! তবু পয়সা পাওরা যায়। টিফিন। আনসার তার অতীতকে দেখেও দেখে না। গালাগালি। চড়-চাপড়—চলতেই থাকে। চলতেই থাকে।

এভাবেই আশে পাশে জমি বিক্রির টাকায় মুসলমান যুবক গ্যারেজ-ঘর, সবজি-ঠেক, মুদি-দোকান, চায়ের দোকান, পানের দোকান, গম ভাঙানোর কল, স্টেশনারি অথবা কাপড়ের দোকান করে নিতে পেরে নিজেকে নিশ্চিন্ত রাখে। তাদের অনেকেরই হিরো হণ্ডা, কাইনাটিক হণ্ডা, কাওয়াসিকি বাজাজ, বাজাজ এম এইট্টি, বাজাজ চেতক, বাজাজ সুপার, রাজদূত, বুলেট, রয়্যাল এনফিল্ড কিনে ফেলেছে,—গতি, গতি গতি—ঝড়ের বেগে রাস্তা পেরিয়ে যাওয়া। কেউবা মারুতি, অ্যামবাসাডারে আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রচার চায়।

স্কুল বলতে ঐ ক্লাস সিক্স, সেভেন, এইট বা তাও নয়। শিক্ষাহীন শৈশব কাটে ঘুড়ি উড়িয়ে, গোবর কুড়িয়ে, চায়ের দোকানে কাপ-প্লেট ধুয়ে, গ্যারেজে ফাই-ফরমাশ খেটে। আর এই শৈশবটুকু মুছে গেলে পিছিয়ে পড়ার বিচ্ছিন্নতায়, লজ্জায় সে কখনও কখনও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আরও বেশি বেশি করে আঁকড়ে ধরে ধর্মকে। অন্ধতায়, সংস্কারে, মাদুলি-তাবিজে, পরিবার-পরিকল্পনাহীন জীবনে বার্ধক্য গড়িয়ে যায়। নয়তো শুধুই ভোগবাদে—মদে, জুয়ায় আর অন্যান্য আনুষঙ্গিকে একই মোমবাতির দু'দিক জ্বালিয়ে জীবনকে বড় দ্রুত খরচ করে ফেলে।

আনসার এতটা শুদ্ধভাবে এ সব হয়ত ভাবতে পারে না। কিন্তু মোটা দাগে কতগুলো বিষয় সে চটপট এঁকে নিতে পারে, যার মূল কথা

—আমাদের শিক্ষা নেই, আমরা কী করব!

ঠিক তখনই রান্নাঘর থেকে রেহনাবিবি তার বারোটি বাচ্চা আগলানো লাল মুরগিটিকে দেখতে পায়! মায়ের গায়ে গায়ে সেঁটে থাকা বাচ্চারা, যেন বা অনেকেই ডানার নিচে নিচে। মা ওদের খুঁটে খাওয়া শেখাচ্ছে। এখন ওরা পিলে মুরগি আর একটু বড় হলে ডেগি হয়ে উঠবে। ডেগির গোসত্ দারুণ। রেহনা কাঠের জালের ভেতরও সেই মাংসের স্বাদ-ঘ্রাণ পেল।

রং-মিস্তিরি সুরেন দেবনাথ একদা বাংলাদেশী।' '৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের সময় উদ্বাস্তু। নাকে রুমাল বেঁধে স্প্রে-গানের কারিকুরিতে অ্যাম্বাসাডার-এর গায়ে রং ছুঁড়ে দিতে দিতে সুরেনের মনে পড়ল অনেক দিন নারায়ণগঞ্জ থেকে মায়ের চিঠি আসে না। তার রং অ্যামবাসাডারের কমপিউটারা-ইজড নম্বরে পেঁছিচ্ছিল না। কাজ করতে এমনই হয়।

বাংলাদেশ হওয়ার পর মা আর ছোট ভাই ফিরে গেল। বউ ছেলে নিয়ে আমি ফিরলাম না। এখনও রানীকুঠিতে একটা ঘর ভাড়া করে থাকি। যেহেতু '৭২ সালের ঘরভাড়া, তাই শ দেড়েক দিলেই এখনই চলে। ইদানীং বাড়িঅলা প্রায়ই উঠে যেতে বলছে। যেহেতু আমি পার্টি করি, তাই পার্টি দেখে। ওঠাতে পারে না।

হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে আমাদের খুলনার বাড়িতে চাড়ি—মাটির বড় গামলায় শোলমাছ রাখা থাকত। চোর সেই মাছ নিয়ে যেত। হাঁসের ঘর খুলে হাঁস। কেন যে হঠাৎ এসব মনে পড়ে। মন খারাপ হয়ে যায়। আমরা ছিলাম শিবগোত্র। বাবা ছিলেন গম্ভীর-বিষয়ী মানুষ।

—দিলীপ, এদিকে চা দে, সুরেনদাকে। আনসার আতিথেয়তায় এগিয়ে থাকে।

কি ছিল আমাদের দেশ! সেখানে আর ফিরে যেতে পারব না। আমার পরের ভাই মন্টু—ভালো নাম হরেন। সে সাফদার হোসেন মন্টু নাম নিয়ে সিরামিক টালির ব্যবসা করে। বড় কারবার। অনেক টাকার লেনদেন। এই নাম বদলে তার পার্টি আর পেমেন্ট পেতে সুবিধে হয়।

বড় মিস্তিরিদাকে চা দিয়েছিস? আনসারের এই আন্তরিকতাটুকু

সুরেনকে ছুঁয়ে যায়।—অ্যাই বাবুয়া, দিলীপ, সুরেনদাকে চা দে। চা দে। অভ্যেস মতো আনসার কথাটি রিপিট করে। আর গালের ভেতর খৈনি লাগানোর পর থুথুতে মিশে যাওয়া তামাকের ধক উপভোগ করতে থাকে।

পরক্ষণেই—দিলীপ, ফরিদ, বাবুয়া দ্যাখ তো—বড় গাড়িটা থেকে টায়ারটা নামিয়ে আন। নামিয়ে আন—বলে আরও একটা কাজের ভার জুড়ে দিতে পারে। দিলীপ ও বাবুয়া—দুজনেই মুসলমান, শুধু তাদের ডাকনামটি হিন্দুর অনুকরণে। তাতে অনেক সুবিধে হয়।

সুরেন গ্যাস কাটারের নীলচে আলোয় তিরাশি সালের মডেলের অ্যাম্বাসাডার-বডি কেটে ফেলতে ফেলতে কী জানি কী মনে করে দূরের কাঁঠাল বাগান, ডুমুর গাছ, মিষ্টু অটোমোবাইলস-এর সাইনবোর্ডের উল্টোপিঠে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাসটুকু চেপে নিতে পারে।

ফরিদ ততক্ষণে সুরেনের হাতে চায়ের গেলাস ধরিয়ে দিয়েছে।

তিন

রাতে বাদামতলা মোড় প্রতিদিনই প্রায় একরকম। বৃষ্টি না থাকলে এগারোটা/বারোটা অব্দি তাস খেলা। জামে মসজিদের সামনে আলো। বিচিত্রা বিপণির রোয়াকে পাগলি। তারও পরে পুকুরে অন্ধকার জল। এই বর্ষায় তার বুকে পানা ছেয়েছে। পারে কোমর বাঁকা খেজুর গাছ। মোতালেবের পান-সিগারেটের দোকান বন্ধ। ইস্তিরি করেন যে বিহারি-মানুষটি, কখনও কখনও প্রায় সারা রাত, তাঁর গুমটিতে হারিকেনের আলো। তার পাশেই ফালি জমির ওপর ভি ডি ও-র আয়োজন। 'ইন্দ্রজিৎ'! 'ইন্দ্রজিৎ'! তারপর 'ইজ্জত'।

এনফিল্ডে ঝড় তুলে আনসার ফিরছিল গড়িয়া থেকে। ছোট পর্দায় চৌকো আলো, সেখানে ছবিতে ফাইটার অমিতাভ বচ্চন। পুলিশ অফিসার ও ছদ্মবেশে দুর্নীতিদলনকারী। জয়া প্রদা নাচে, যৌবনে, লাস্যে ফেটে পড়েছিল।

'আজুবা' 'হাম', 'যাদুগর'—পর পর ফ্লপ। অমিতাভর মার্কেট ভালো যাচ্ছে না। শুধু 'হাম'-এর সেকেন্ড পার্টটা, যখন অমিতাভ

চশমা পরে ভালো হয়ে গেছে, পুজো করে—তখনই যা একটু অ্যাকটিং। আর 'ঝুম্মা চুম্মা দে দে'—ঐ নাচটা—।

'ম্যায় আজাদ হুঁ'-তেও দারুণ অ্যাকটিং। কিন্তু আমার ভালো লাগে নি। বচ্চনের শেষ ভালো বই বোধহয় 'আখিরি রাস্তা'। এসব ভাবতে ভাবতেই আনসার লাল এনফিল্ডের লাগাম টেনে ধরল। ভি ডি ও-র পর্দায় তখন রঙিন হেলিকপটার উড়ছে। আনসার জানে শেষ দৃশ্যে ইউনিফর্ম পরা অমিতাভকে কেমন করে জড়িয়ে ধরবে জয়া প্রদা। 'মধুবন'-এ এখন মিঠুনের 'স্বর্গ ইঁহা, নর্ক ইঁহা'।বাবা-ছেলে—ডবল রোল। মিঠুনকে আমার একেবারেই ভালো লাগে না। তবু এটাতে নাকি খুব ভালো করেছে মিঠুন।

যেটুকু আলো ছিটকে আসছে পর্দা থেকে তাতেই কালো কালো মাথাগুলি দেখে নেয়া যেতে পারে। সবাই মগ্ন ছবির অ্যাকশানে। শরীর দিয়ে অভিনয় বুঝে নিতে তারাও ঘটনার অংশীদার হতে চাইছিল—যেমনটি যেমনটি পর্দায় ঘটে যাচ্ছে!

আনসারের মাথায় পেনিয়ান, ফ্যান বেল্ট, সাইলেন্সার পাইপ, একজস্ট পাইপ, প্রেশার প্লেট, ব্যানজো থ্রেড ইত্যাদি শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার গ্যারেজে এখন অনেক কাজ।

আমি তো ওপনিং ডে-তেই মালপ্তে মেরে দিয়েছি 'ইন্দ্রজিৎ'—এটুকু ভেবে নিয়ে এনফিল্ডের চালু হয়ে ওঠার জায়গাটিতে লাথি মারল আনসার। তার গ্যারেজের সামনে ভেতর থেকে আসা টিউব-আলোয় ক্লাবের সামনের গাড্ডায় ভর্তি হয়ে থাকা কচুগাছের কিছু পাতা-ডাঁটা আলোয়। বাকিরা অন্ধকারে। যেমনটি ঐ ভি ডি ও-দর্শকদের মাথার সারি।

সবজি-ঠেকের সামনে চিচিঙে, মাদ্রাজী-ওল, পটল, ঢ্যাঁড়শ, শশা, ঝিঙে, কাঁকরোল, কাঁচা লঙ্কা—আলাদা আলাদা ঝুড়িতে। তাদের কোনোটার মাথায় কলাপাতার ঢাকনা, কারোর বা চট অথবা রঙিন প্লাস্টিক। তরকারি নিয়ে যাওয়া সাইকেল-ভ্যান, বড় রাস্তার ওপর চালু হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ম্যাটাডোর—সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

সবজি-ঠেকের অনেকেই ভি ডি ও-দর্শনে। শুধু দুটি আলো একলা একলা জ্বলে যাচ্ছে।

পুলিশ ওয়ারলেসের জিপ-বডি রঙ হয়েছে। ইঞ্জিন বাঁধিয়েছি নতুন

করে। তেল আছে। এটুকু ভেবে নিয়ে আনসার জিপের ড্রাইভিং সিটে লাফিয়ে ওঠে। অন্ধকার ভাঙে তার হেডলাইট। এখান থেকে স্পিডে গাড়ি চালিয়ে সেন-দিঘি যেতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। ইঞ্জিনটা ট্রায়ালও দেয়া হবে। আর এই গরমে জলের ধারে বসে থাকলে ঘামও মরবে। এটুকু ভেবে নিয়ে সে সেন-দিঘির পারে পেঁছে যায়। যেদিকে ঘাট, জোড়া বট-অশ্বত্থ, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, সেখানে বড় অন্ধকার। আলো নেই। রাত হয়েছে, সাপখোপ থাকতে পারে।

বরঞ্চ উলটো দিকে এই ফাঁকা মাঠে, সামনে দিয়ে হাই টেনশন লাইনের তার চলে গেছে। বাঁ দিকে বিশাল পোস্ট। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা, হয়ত ছটা তারও চলে গেছে। জ্যোৎস্নামাখা আকাশের গায়ে সেইসব তারদের দেখে মনে হতেই পারে কেউ বুঝি রুল টেনে দিয়েছে আকাশে। তাঁর ফাঁকে ঘষা রুপোর পয়সা হয়ে চাঁদ লেগে আছে।

আলোয় আলোয় চারপাশ ছয়লাপ। ডানপাশে বন-কচুর বাড়-বাড়ন্ত—মাটির ভাঙা, ঢালু পাড় দেখা যায় অনেকটা। তারপর জল। ওপার থেকে কোনো টিউবের আলো, বাড়ির লাইট, জলছুঁই করতে করতে ছড়িয়ে এসেছে এপার পর্যন্ত। হাওয়ায় সেই আলো কেঁপে কেঁপে মাঝে মাঝেই ভাঙে।

উঁচু পাড়ের সামনে মুরগির গু ঢিপি করে ফেলা। তার কাছাকাছি জিপ থামাল আনসার। জিপের ফ্যান-বেল্ট ঠিক নেই। চালিয়ে দেখলাম। কাল সকালে আবার ওটা নিয়ে পড়ব। এটুকু ভেবে নিয়ে আনসার ঘাসের ওপরই বসে পড়ে। বর্ষার ঘাস, সামান্য ভিজে ভিজে। প্যান্টের আবরণ পেরিয়ে এই প্রাকৃতিক শীতলতাটুকু তার শরীর পেয়ে যায়।

হাইপার টেনশন লাইনের ফাঁকে চাঁদ তেমনই যুবতী, ভরা জ্যোৎস্নায় তার খল খল হেসে ওঠা। আর কখনওবা মেঘের আব্রুতে মুখ ঢেকে গেলে আলোয় কেমন যেন ঘোলাটে ঘোর লাগে। মাটি মাটি-রং পেয়ে যায় রুপোলী আলো। আকাশে অন্ধকার ছড়ায়।

প্রকৃতির এই রূপমুগ্ধতা আনসারকে তেমন করে বেঁধে না। অথচ একলা, এই দিঘির পাড়ে, হাওয়ায় তার মাথায় আরাম লাগে। পেছনের ছোট মাঠটিও জ্যোৎস্নায় ডুবেছে। আকাশে চাঁদের নিত্যনতুন মেঘ-সাজ। রাত বাড়ছে। পেটের ভেতর খিদের মোচড়।

লাফিয়ে জিপের ড্রাইভিং সিটে উঠল আনসার। তারপর ফ্যান বেল্ট ঠিক করাতে হবে কাল সকালে—এই ভাবনাটি মাথায় নিয়ে মিন্টু অটোমোবাইলস-এ ফিরে এলো। জাকিরের ইট-বালির দোকানের সামনে এখন অনেক স্টোনচিপ। বাঁশ।

চার

দেখতে দেখতে আরবী সনের প্রথম মাসটি এসে যায়। মুর্শিদাবাদ থেকে আসা রাজমিস্ত্রি সেন্টু শেখ আর তার সঙ্গীরা জন্মসূত্রে শিয়া এই গর্বটি নিয়ে মহরম আসার সাত/আট দিন আগে থেকেই জ্ঞাতি-হত্যার—বহু বছর আগে ঘটে যাওয়া কারবালা-সংঘর্ষে নিহত হজরত ইমাম হাসান আর ইমাম হোসেন স্মরণে এভাবে শোকগাথা গেয়ে উঠতে পারে। 'মরশিয়া' নামের এই গানে সেন্টু তো থাকেই। আর থাকে জবেদ, আলি, আইয়ুব, শাহিদ—এরা কেউ মিস্ত্রি, কেউ যোগাড়ে, কেউ বা ফিরিঅলা।

মুর্শিদাবাদে কারবালার মাঠ আছে। বাড়ি বাড়ি মরশিয়া গেয়ে কিছু চাল, পয়সা পাওয়া যায়। এখানে তেমন কোনো রীতি নেই। তোমরা সবাই সুন্নি। মোহার্‌রাম মাসের ১০ তারিখে কারবালার শোক স্মরণে তোমরা প্রথম দশ দিন রোজা রাখ কেউ কেউ। দান-খয়রাত, কোরান-তেলাওয়াত্‌।

গান গাইতে গাইতে হেঁটে চলা দলবলের 'মাস্টার' সেন্টু এসবই ভেবে নিতে পারছিল।

তার এও মনে হচ্ছিল, আমরা তো জ্ঞাতি হত্যার পাপে, শোকে গেয়ে বেড়াই—ওগো কে সে মদিনা বাজার/দিনেতে হলো আঁধার····হোসেনের শোগে কাতর হায় হায়····

হোসেন হাসান দোনু ভাই রসুলের নাতি হয়/সালাম করিবেন সবাই হায় হায়।

জয়নাত রূপেতে হায় এজিদ কামিনা পাগল হয়/এতে বিপদ ছেড়ে যায় হায় হায়।

দারু দাতা মরিতে যাইব আমি মদিনাতে/খোদা যদি রাজি থাকে

হায় হায়।

ব্রহ্মপুরে মহরমের সাত/আট দিন আগে থেকে এ গান হয় না। সকলেরই কাজ আছে। ক্লান্তি আছে। তাই মহরমের আগে রাত থেকে সেন্টু শেখ 'মাস্টার' হয়ে তার মরশিয়া গানের দল নিয়ে রাতে, রাস্তায় বেরোতে পারে। হাতে খাতা। তাতে গানের লাইন। সুরের ধারা একই রকম প্রায়। তার কোথাও কোনো বৈচিত্র নেই।

সেন্টু তরকারির ঠেকে মরশিয়া গান এভাবে গেয়ে ওঠে—মাইমুনা কুটনি ভাই দারুবালে জহর দাই/সেই খবর জানাই যায় হায় হয়....

বুকের উপর দিয়ে হাত শুনো বলি ছোট বাপ/প্রাণে মরিয়া যায় হায় হায়।

ভায়ের কথা শুনিয়া দুই ভাইতে মিলিয়া/কারবালাতে শহিদ হয় হায় হায়।

সেই কথা বলিয়া দুই ভাইতে মিলিয়া/জানাতে গেল চলিয়া হায় হায়।

সখিনার সাথে ভাই কাশেমের শাদি হয়/সত্য জনব করে যায় হায় হায়।

সেন্টু শেখ তার মরশিয়া গানের 'মাস্টার' হয়ে ওঠার গুরুত্বটুকু নিয়ে তরকারির ঠেকে দু'হাত তুলে তুলে গানে গলা তোলে। বাকিরা গলা দেয়। আর কিছু ভিড় তখনই হতে থাকে। মুর্শিদাবাদের লোকেরা তো আছেই, এমনকি জয়নগর, ক্যানিং, বারুইপুরের মানুষেরাও। কৌতূহল থাকে। নতুন জিনিস দেখার আনন্দ, অথবা নেহাতই দেখছি—এরকম একটা ভঙ্গি থেকে যায়।

গাড়ির অনেক কাজ বাকি! পার্টি নিয়মিত ঝাড় দিচ্ছে। আজই মানব মিত্র এসেছিল তার গাড়ির ব্যাপারে। যাচ্ছেতাই বলে গেল। মাথা নিচু করে শোনা ছাড়া কিছু করার থাকে না। বিল আটকে যাচ্ছে। অথচ ডে টু ডে মিস্তিরিদের পেমেন্ট আনসারকে করতেই হয়। সকাল থেকেই মটকা গরম। মাথা তেতে আছে। হুল ডুবাডুব ঘুরে—এলোমেলো, ওদিক-সেদিক, চারদিকে গিয়েও কোনো রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই তাকে গাল দিচ্ছে।

কুদঘাটে আশরাফের গ্যারেজে সামান্য ম্যাকডোয়েলের ধক্ আনসারকে যেন বা কিছু প্রতিবাদী করে তোলে। তার ওপর কাজের

টেনশন। মরশিয়ার সুর শুনে সে তরকারির ঠেকে ছুটে যায়—আর এসব বালছাল এখানে নয়, যা টালিগঞ্জের ওপারে, যেখানে মহরম হয় সেখানে কর। এটুকু বলে সে সেন্টুকে ধমক মারে।

আনসার ভুলে যায় সেন্টু তার নানার ভাড়াটে নয়, তার কর্মচারী নয়। সে স্বাধীন রাজমিস্ত্রী। এখন রোজ পায় ষাট টাকার ওপর। থাকে মসজিদের জমিতে তোলা টালির বাড়িতে। তার জন্যে মাস গেলে গুনে ভাড়া দিতে হয়। তার ওপর সে তার দলের 'মাস্টার'। শুধু মুর্শিদাবাদেই নয়। সে তো খিদিরপুর, পার্কসার্কাস, এন্টালিতেও মরশিয়া গেয়ে থাকে।

সেন্টু এ ধমকানিতে সামান্য থমকে যায়। কিন্তু থামেনা। গান চলতে থাকে। আর এই না-জায়েজি কাণ্ডের জন্যে আনসার তাকে চড় মারে।

সেন্টুকে মারার আগে আনসার যা যা ভেবেছিল তা এরকম।—আমরা সুন্নি। আমাদের এ সবই না-জায়েজি। পারলে মহরম মাসে রোজা রাখব, নয়তো নয়। মহরমের দিন তলোয়ার-লাঠি খেলব না। তাজিয়া, দুলদুল বের করব না। হা-হাসান, হা-হোসেন করে বুক চাপড়াব না। বাড়িতে এদিন গোস্ দিয়ে খিচুড়ি হবে। খাব। পবিত্র ভাবে মনকে রাখব। আর তা নয়, এই সব বুক চাপড়ে চাপড়ে গান, মহরমের আগের রাতে—বাবার জন্মে কোনো দিন দেখি নি।

থাপ্পড় খেয়ে সেন্টু শেখ বুঝতে পারে এটা মুর্শিদাবাদ নয়। এখানে কোনো কারবালা নেই। তাই ব্যথা ও অপমান হজম করে তাকে চুপ করে যেতে হয়। আনসার তার হাত ধরে তরকারির ঠেক থেকে নামায় ও 'যা, বাড়ি যা' বলে একটু জোরে ঠেলে দেয় বুঝি। সেন্টু পড়তে পড়তে গালাগালি চেপে রাখে—এটা পরদেশ, মার খাওয়ার ভয়ে। তারপর অপমান হজম করে সেও তো মনে মনে এটুকু বলে নিতে পারে—আমরা শিয়া, তোদের মতো জমির লোভে মুসলমান হইনি। ইরান থেকে বহুকাল আগে বহে আসা—রক্তধারা, অথবা ইরানী মুর্শিদকুলির বংশলতার যে গৌরব চিহ্ন—তা কিছুই আঁকা থাকে না সেন্টুর শরীরে। সে কালো, বেঁটে। অথচ ইরানী ধারাবাহিকতার দাবিদার।

গোটা মরশিয়া দলটি কেমন যেন ঝিম মেরে যায়। আর আনসারের মাথার ভেতর টলটলানো ম্যাকডোয়েল, যা পবিত্র শরিয়তী বিধানে

সম্পূর্ণ হারাম, ফুটে উঠতে থাকে গাড়ি ঠিক ঠিক ডেলিভারি দিতে না পারার রাগে। তা ঝপাং করে উছলে উঠে বেরোয় মরশিরা-সুরে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সেই প্রাচীন কিস্যার কথায়।

পরদিন মহরম।

তারপর দিন আনসার দুটি চিঠি পায়। একটি মসজিদ কমিটি থেকে। অন্যটি লোকাল নাগরিক কমিটির কাছ থেকে। সেন্টুকে অন্যায়ভাবে মারধোর করার জন্যে তার বিচার হবে।

গ্যারেজে অনেক কাজ। সময় মতো কিছুতেই শেষ করা যাচ্ছে না। এমন ভাবনা আনসারকে ক্রমাগত ঝিম ধরিয়ে দেয়।

আনসার বুঝতেও পারে না সে কোথায় ঘা মেরেছে। এতগুলো মুর্শিদাবাদী ভাড়াটে, তাদের মাস-ভাড়া, সবই মসজিদ কমিটি পায়, যেহেতু তাদের জমির ওপর এই সব টালির ঘর।

পার্টি তো ভোট জানে। তাই নাগরিক কমিটি চিঠি দেয়। এতগুলো জেনুইন ভোটার। তাছাড়া গোস্-ভাতের যে গোটা দুই হোটেল আছে,—এরা একটা মাসুদেরও।—তারাও পার্টির ক্লোজ সিমপ্যাথাইজার এখন। চাঁদা আসে মাস গেলে। মাসুদ তো ওদের হয়ে ঝাণ্ডাই ধবে। হোটেলের মূল খরিদ্দার মুর্শিদাবাদের মানুষ —রাস্তায় শুক আর ঘরে শুক, তাকে তো দুবেলা পেটে কিছু দিতে হয়। মাসুদের তো গ্যারেজও আছে। সব মিলিয়ে আনসার এখন এমন এক জালে, যার থেকে বেরনোর রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে সে বারে বারে হাঁপিয়ে ওঠে।

আজ বৃষ্টি নেই। কাল শুক্রবার। জুম্মা পড়ার পর দুপুরে আনসারের বিচার। পার্টির বিচার রবিবার।

আকাশ তেমনই মেঘহীন, ধূসর, রৌদ্রাভ।

বেলার দিকে মেঘ ঘিরে আসে।

বিকেলে মেঘমাখা আকাশ দেখে আনসার ভয় পায় রংয়ের কাজ শুরু করতে। একবার বৃষ্টি শুরু হয়ে যদি না থামে, তাহলে সব রং ভোগে।

সন্ধ্যা লাগার একটু আগে সঙ্গীদার মা তাকে খবরটি দেয়। আসগারের বিয়ে। সঙ্গীদার খালাতো বোনের সঙ্গে। মেয়ে চন্দনেশ্বরের,

পছন্দ হয়েছে। দেনা-পাওনা মিটে গেছে। দিন দশ পর 'দিন ধরা'—পাকা দেখা। সঙ্গীদার মা এমনিতেই পাড়াবেড়ানি। একদা কথা এ ঘর ও ঘর করার স্বভাবের জন্যে তার নাম ছিল দারোগা-বুড়ি। এখনও সে নাম বহাল আছে। মধ্য বয়স পেরনো, ডাঁটো শরীরের এই নারী কথাটি আনসারের কানে তোলে অসম্ভব নির্দোষ মুখে। সে জানে আনসার মামার বাড়ি শোয় না। আসগারের সঙ্গে এক বিছানায় শোয়। ফলে তার মুখের বিপন্নতার পাঠক্রম পড়ে নিতে সঙ্গীদার মায়ের অসুবিধে হয় না।

আনসার সম্পর্কে তার নানির দিকে তাকায়। আকাশে এখন অনেক মেঘ। ভেঙে বৃষ্টি নামতে পারে যে কোনো সময়ে। দূরে কোথাও জল হচ্ছে। ভিজে বাতাস উড়ে এসে ছুঁয়ে যায় আনসারকে।

আবার শোয়ার জায়গা খোঁজা, নতুন কোনো ঘর। কার বাড়িতে শোব আমি! শুধু রাতের জন্যে কে ঘর ভাড়া দেবে? একলা পুরুষ মানুষকে কেউ ঘর ভাড়া দেয়! আর ভাড়া ঘরে থাকব, মামা বাড়িতে খাব—এটা হার্গিজ হয় না। নানি, মামা-মামি কেউ মেনে নেবে না। আর খাওয়া-শোওয়া সব আলাদা—সেও এখন খরচে পোষান মুশকিল। শুধু তো আমি নয়, আক্রামও আছে। যা কাজের ধারা, তাতে রান্নাবান্না করে হবে না। রোজ হোটেলে খেলে শরীর ভাঙবে—আমি কোথায় দাঁড়াব!

দিন ধরার পর বড় জোর এক মাস, দুমাস, তিন মাস—তারপর তো স্বাভাবিক নিয়মেই আসগার বিবি নিয়ে। আর আমি! এটুকু ভেবে নিয়ে আনসার একটু হেঁটে এসে জাকিরের দোকানের সামনে টাল করে রাখা বাঁশের ওপর শরীর ছেড়ে দিয়ে ঢিপ করে বসে পড়ে। তার পা, পাছার নিচে থেকে আলগা সব বাঁশ সরে সরে যেতে থাকে।

নিজেকে নিয়ে আমি কোথায় কোথায় যাব!

বাঁশের ওপরে বসে এসবই ভাবছিল আনসার। মাঝে মাঝেই শরীর নড়ে ওঠে, বাঁশ সরে যায়। আমি কি এখন কদিন ক্লাবে শোব, চাবিটা চেয়ে নেব সেক্রেটারির কাছ থেকে! নাকি সবজির ঠেকে—মেঝেয়—মাদুর আর কাঁথা বিছিয়ে। শীতে গায়ে একটা চাপা। দাঁড়ি-পাল্লা, বাটখারা, বেগুন-পটল-মুলোর ঝাঁকা, রান্না হাঁড়িকুড়ি, বসে হিসেব লেখার চেয়ার-টেবিল।

'সন্তোষ' টেপ রেকর্ডারে অবিরাম বেজে যাওয়া 'বেদের মেয়ে জোস্‌না'। নয়তো মহম্মদ রফির পুরনো দিনের কোনো কোনো গান।

খুব ভোরে উঠে সবজি ঠেকের সিরাজুল মুখটুখ ধুয়ে আজমীর টনিক খাবে। রামের পাঁইট সাইজের শাদা কাচের চ্যাপটা বোতলের গায়ে লেখা—৭৮৬—ইংরেজিতে, তারপর চাঁদতারা। পাশে দুলাইনে লেখা—যথা ধর্ম তথা জয় ব্যবহারে পরিচয়।

দুধ ছাড়া চায়ের লিকার রঙের তরল বোতলে। বারো টাকায় গ্যাস্ট্রিক, অম্বল, পেটের ব্যথা, আমাশয়, কালজার বেদনা, কাশি, হাঁপানি, মেয়েদের বাধক, সুতিকা, মেহ-প্রমেহ, ধাতু-রোগ—সব সারবে—এমন গ্যারান্টি দেয়া ছাপা লেবেলে।

হেকিম : মোঃ করিম শেখ।

গ্রাম ও পোঃ—রামনাথপুর। থানা—দেগঙ্গা, উত্তর ২৪-পরগনা। মিলন বাজার, চড়াবদ্যা। ৪৮ নম্বর বাস স্ট্যাণ্ডে হেড অফিস আছে।

সিরাজুল বোতলটি থেকে গেলাসে ঢেলে টনিক খাবে। টেম্পো অ্যাকসিডেন্টের পর হাসপাতাল থেকে বেঁচে ফিরে তার বাঁধানো দাঁত।

তারপর ভাত চড়াবে। ডিম সেদ্দ। ডাল, তরকারি। পাম্প-স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ। অত সকাল সকাল রোজ ঘুম থেকে উঠতে আমি পারি না। উঠতেই হবে।

ক্লাবে শোওয়ার ঝামেলা অনেক। রোজ চাবি আনো। সকালে গিয়ে চাবি বুঝিয়ে দিয়ে এসো। তার থেকে একটা ঘর নিলে, যেমন ঘরে মুর্শিদাবাদ, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবারের লোকেরা থাকে! সেই মসজিদ কমিটিকে বলতে হবে। ওরাই তো আমার বিচার করবে সেন্টু শেখকে মারার জন্যে। হয়ত নগদ টাকা জরিমানা।

ঘর একটা পাওয়া গেলে, সেই হয়ত সেন্টু শেখের পাশেই। দু বেলা মুখ দেখাদেখি। অন্ধকারে এসব ভাবতে ভাবতেই আনসার এক রাউণ্ড খৈনিতে যেতে পারল।

আসগরের বিয়ে হয়ে গেলে ওবাড়ি আর থাকা যাবে না। মামার বাড়িতে থাকার অসুবিধে। নতুন করে কেউ আমায় সেখানে থাকতে বলবে না। এমন কোনো চেনা-পরিচিত, বন্ধুর বাড়ি শোয়া ঠিক হবে না—যেখানে ডাগর মেয়ে আছে। তাতে কোথাকার কথা যে কোথায় ফ্যাচাবে!

রাতের থাকা তো একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কামালগাছি থেকে সাইকেলে রোজ যাতায়াত করে আক্রাম। আমি পারি না। ও বাড়ি আমার কাছে দূর বিদেশ। আমার কাছে ব্রহ্মপুরই সব।

দু এক ফোঁটা জল পড়ল মাথায়। হয়ত বৃষ্টি নামবে। কই, আসগর বিয়ে করবে আমায় তো একবারও জানাল না! আমি কি ওর হয়ে বিয়ে বসতাম! পাশাপাশি শুই, তেমন করে তো জানতেও পারি নি। হ্যাঁ, মেয়ে দেখাদেখি হচ্ছে। আক্রাম যাচ্ছে, বুলেট-এ তেল ভরে—সে সব টের পেয়েছি। কিন্তু দিন-ধরাই বা কবে হলো! সেও তো দিন ঠিক হওয়ার পর জানলাম। বিয়ের খবর শুনতে হলো দারোগা-বুড়ির কাছ থেকে!

খৈনির থুথু গাল থেকে নামাতে গিয়ে আনসার আবারও বাঁশের ওপর গড়িয়ে গেল। আর নিজেকে সামলে নিতে নিতে অনেকদিন পর তখনই তার মনে পড়ল মাঝে মাঝে দেখা রহিমাকে।

অনেকগুলো সবজির ঠেক-এর একটির মালিক হামিদ, আসগরের আব্বা। আনসারকে ডেকে বলল, আসগারের খয়ের-পাতাটা তুই নিয়ে যাস অ্যামবাসাডারে। যাওয়া-আসা—চন্দনেশ্বর তো ছাব্বিশ কিলোমিটার। সঙ্গে জাকাত যাবে। পানির সময়। দরকার কি বাপু, আর লোকে!

তা কত দেবে?

তেল ভরতে একশো নিস। তোর মিষ্টি খাউনি পঞ্চাশ।

মিষ্টি-খাউনি থাক। তেলের জন্যে একশো পঁচিশ দিও। কাল রবিবার, এদিকে সব পাম্প বন্ধ। আজই তেল তুলে রাখতে হবে। আনসারের একথায় হামিদ আর না করেনি।

বাইশ হাজারে বেচে দিয়েছি এনফিল্ড। নতুন বাজাজ-চেতকে আমার আরও কিছু টাকা ঢুকে গেছে। এনফিল্ড-এ মাল আনা-নেয়ার বড় অসুবিধে ছিল। বাজাজ-চেতক-কে নিয়ে সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্দি। ভাবতে ভাবতে আনসার ঘুরে বসল।

পাঁচ

সোনারপুর মোড়ে এসে বেশ খিদে পেল আনসারের। রাত তখন প্রায় আটটা। একটু আগে আকাশ কালো করে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ওয়াইপার চললে ব্যাটারি খরচ হয়। পার্টির ব্যাটারি। তাই বার বার হলুদ কাপড়ে ভেতরের কাচ মুছে মুছে স্টিয়ারিং সামলাচ্ছিল আনসার। সোনারপুর মোড়ের কচুরি বেশ ভালো। ষাট পয়সায় একটা। সঙ্গে চাটনি। গোটা-ছয়েক খেয়ে নিতেই আপাতত পেট জুড়োলো।

ব্রহ্মপুর থেকে ছাব্বিশ কিলোমিটার চন্দনেশ্বর। ছাব্বিশ যাওয়া, ছাব্বিশ আসা। অ্যামবাসাডার জোরে গেলেও ঘণ্টা তিনেক। খয়ের-পাতা নিয়ে যাওয়ার দায়-দায়িত্ব আনসারেরই।

আসগরের বিয়ে কাল। তাই আজ রাতে খয়ের-পাতা। পেঁছিলে কনের বাড়ির লোকজন নিশ্চিন্ত, কাল বর, বরযাত্রী আসছে। বিয়ে হচ্ছে। পেছনের সিটে বড় মামার মেয়ে অন্‌জুমান। এখন ক্লাস ওয়ান। খয়ের-পাতা নিয়ে গাড়ি যাচ্ছে বলে সেও উঠেছে। আর আছে জাকাত, আসগরের চাচাতো ভাই।

একটু আগেও পানি জোরে পড়ছিল। আশ্বিন শেষ হতে এলো, অথচ বর্ষার দিনের পানি। আনসারের চোখে কয়েকদিন আগে জয়বাংলা হয়েছিল। জ্বালা, চুলকোনি কমে গিয়ে ফুলো আর লালটুকু রয়ে গেছে। চোখে গগলস ছিল আনসারের, কাচের, হালকা রঙের। কলা কিনে নিয়ে যেতে বলেছে সোনারপুর মোড় থেকে, বলতে বলতে জাকাত ছাইরঙা অ্যামবাসাডারের দরজা খুলে রাস্তায়।

তুই কচুরি খাবি? নিজের খিদের আগুনে কচুরি-তরকারি ফেলতে ফেলতে আনসার সহজেই এমন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারে।—না। আমি বাড়ি থেকে ক্ষীর-রুটি খেয়ে এসেছি।

আনসার জানে অন্‌জুমান কচুরি খাবে না। ওর জন্যে একটা কোকো দেয়া বরফি। তারপর পয়সা মিটিয়ে জলের গেলাসে মন দেয়া।

সোনারপুর ছাড়িয়ে কিছুটা যাওয়ার পরই রাস্তার দু-পাশে আলো মুছে গেল। স্ট্রিট ল্যাম্প নেই। বৃষ্টি ভেজা আকাশ। দুধারে ধানক্ষেত

আর ছায়া দেয়া বড় বড় গাছ। হেডলাইটের জোড়া আলোয় রাস্তার অন্ধকার ছিঁড়ে যাচ্ছিল। পাশ দিয়ে আস্তে গড়িয়ে যাওয়া-সাইকেল, রিকশা-ভ্যান। কখনও ছাতা মাথায় একজন দুজন স্বাস্থ্যবান, লম্ফমান ব্যাঙেদের কেউ কেউ বৃষ্টির আনন্দে রাস্তা পারাপার করছিল। হেডলাইটের হলদেটে আলো বৃষ্টিমাখা রাস্তায় তাদের কারও কারও ছোট ছায়া তৈরি করতে পেরেছিল।

জাকাত বলছিল, খয়ের-পাতা নিয়ে যাচ্ছি, রাতে নিশ্চয়ই মুরগির গোস্, পরোটা, দু তিন রকম তরকারি।

আনসার একটা ভিজতে থাকা গোরুকে কাটিয়ে নিতে নিতে বলল, পরোটা নাও হতে পারে। এদিকে তো ভাতের চল। তবে যারা খয়ের-পাতা নিয়ে যায়, তাদের তো বরের যত্ন। ও জাকাত, মিষ্টি নিয়েছিস! নতুন কুটমবাড়ি বলে কথা।

গলার স্বর তরঙ্গে কোনো বৈচিত্র না এনে একইভাবে কথাগুলো বলতে পেরেছিল আনসার।

নতুন গামছায় আমায় যা বেঁধে দিয়েছে—বলতে বলতে জাকাত বাইরের দিকে তাকাল। গাছের নরম নরম ডাল, পাতা নুইয়ে দিয়ে তার ওপর বৃষ্টি পড়ছিল।

কুটমবাড়িতে মিষ্টি নিয়ে যেতে হয়, বলতে বলতে আনসার পাকা হাতে গাড্ডা বাঁচাল।

ঠিক রাস্তায় যাচ্ছি তো রে জাকাত?

আরে সে তো তুমি বলবে। দিন ধরার দিন তো তুমিই এসেছিলে গাড়ি নিয়ে।

আনসারের মনে পড়ল সেদিনও তার গ্যারেজে মানব মিত্রর অ্যামবাসাডার। আনসার তো তার গ্যারাজের জন্যে যেমন গাড়ির একসেলেটর, রেডিয়েটর, কার্বোরেটর জানে, তেমনই তার জানা অ্যামবাসাডার, জিপ, মোটর সাইকেল, স্কুটার বা ম্যাটাডোর নিয়ে ওড়ার সহজ পদ্ধতি।

গাড়ির কাচে বিনবিনে বৃষ্টি-ফোঁটা। হলুদ কাপড়ে তা মুছে ওয়াইপার থামাল আসিফ। আর এভাবেই সামান্য আলোকিত একটি তে-মাথানি সে দেখতে পেয়ে যায়। ডানদিকে ঘুরলেই চন্দনেশ্বর। বৃষ্টি সামান্য ধরে এসেছে।

আর আবারও সেই অন্ধকারের ভেতর হেডলাইটের আলো হাতড়ে

হাতড়ে চলা। ঝাঁকড়া গাছের ডাল-পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল-বাঁকা হয়ে। হয়ত আগেকার জমা জল।

আর মিনিট পনের এদিক-ওদিক করার পর অন্ধকারেই আনসার আসগরের হয়ে উঠবে শ্বশুরবাড়িটি দেখতে পায়।

সামনে রঙিন প্লাস্টিক ঢাকা কী কী যেন সব। বাঁ হাতে একটা বেশ বড় পুকুর। জল প্রায় পাড় ছুঁয়েছে। তার বুকে বৃষ্টি-ফোঁটার দাগ। এখানেও মোটরের হেডলাইট-আলোয় লাফানো ব্যাঙেরা তাড়াতাড়ি জায়গা বদলানো সেরে নিচ্ছিল।

আনসার চোখ থেকে রঙিন চশমা খুলে বুক পকেটে ভাঁজ করে রাখল। জাকাতকে বলল, খয়ের-পাতার পোঁটলাটা তুই নে। তারপর অনজুমানকে ঘাড়ে বসিয়ে পা টিপে টিপে হাঁটতে লাগল।

পুকুরের জলে জেনারেটরে জ্বলা টিউবের এক খাবলা আলো পড়েছে। জেনারেটর চলছে আজ থেকে, তাই আলো। প্যান্ডেলে মিলাদ-এ নবীর আয়োজন। কে যেন ,মাইকে বার বার গলা ঝাড়া দিয়ে দিয়ে সবাইকে মিলাদ-এ আসতে বলছিল।

পুকুর, কাদা, পেছল পথ পেরিয়ে সাবধানে পা ফেলছিল আনসার। তার পাঁচফুট দশ ইঞ্চি চেহারায় বডি ব্যালান্সের আয়োজন। অনজুমান চুপ করে তার মেজদার ঘাড়ে বসেছিল।

সোনারপুরের কচুরি কখন যেন হজম হয়ে গেছে। পেটে খিদে গুলোচ্ছিল। আনসার মনে মনে নানা ধরনের সুখাদ্যের গন্ধ পাচ্ছিল। আলো পাওয়া গেল একটু পরে। এই জেনারেটরেরই। জল বেরনোর জন্যে নালি কেটে দেয়া হয়েছে। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর আনসার বিয়ে বাড়ির উঠোন পেয়ে যায়।

কই! কেউ তো এলো না আমাদের খাতিরদারির জন্যে! শত হলেও আমরা তো ছেলের বাড়ির লোক। ছেলে যা যত্ন পাবে কালকে, আজকে আমরা তো সেরকম প্রায়। এরকম ভাবতে ভাবতেই আনসার আলোর একেবারে কাছাকাছি পেঁছে যেতে পারে।

মাটির দাওয়া অনেকটা উঁচু। অন্তত সাড়ে চার ফিট তো বটেই। সেখানে ওঠার সিঁড়িও মাটির। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা দাওয়ায় চৌকি।

সিঁড়িতে পা দিয়ে সাবধানে উঠে এলো জাকাত। সিঁড়ির মুখে অনজুমানকে সাবধানে নামাল ঘাড় থেকে। এখানে জেনারেটারের টিউব।

চৌকির ওপর সুপুরি কুচোচ্ছে একজন। স্টিলের বাটিতে জমছে কালকের পান-মশলা। চৌকির একপাশে, বাঁশের বেড়ার গা ঘেঁষে সুতির মশারি। তার ওপর নানান জাতের বাদলা-পোকা। লম্বাটে এক ধরনের পোকার গা থেকে দুর্গন্ধ।

সামনে দড়ির দোলায় দোলার জন্যে দুটো বাচ্চা মারামারি করছিল।

বদনায় পানি এলো ওজু, পা ধোয়ার জন্যে। পায়ে কাদা ছিল। আনসার প্যান্ট তুলে গোছ পর্যন্ত ভিজিয়ে পা ধুয়ে নিল। তারপর গামছা। এরপর জাকাতের পা ধোয়া।

পা-হাত ধোয়ার পানি এনেছিল মেয়ের মেজদা জুম্মান। কিন্তু সে তো সালাম দিল না। আনসার অবাক হলো। দিন ধরার দিনই ওকে ভালো করে চিনে গেছিল আনসার।

এবার শরবত এলো, তার সঙ্গে খাওয়ার জল। জলে বোধহয় একটু নুনও, এসব এদিককার জামাই-ঠকানি-কায়দা। মনে মনে একটু রাগ হলেও আনসার শরবতের গ্লাস তুলে নিতে ভুল করল না। কাচের গ্লাসে শরবতের গভীরে জেনারেটরের টিউব-আলো ডুবে যাচ্ছিল।

জাকাতের কাচের গ্লাসেও শরবতই ছিল। অনজুমান শরবত খাবে না। সে উল্টো দিকের ল্যাপা-পোঁছা মাটির দেয়ালে ক্যালেন্ডারের নানা রকম রঙিন ছবি ঝোলান দেখতে পাচ্ছিল। তার কোনোটা তাজ-মহল, কোনোটায় সরু একফালি চাঁদের পাশে ওড়না ঢাকা, দোয়া চাওয়া নারী। অন্য একটি ছবিতে চোস্ত-পাঞ্জাবি, বুককাটা জরি বসানো কোট পরা শিশু, মাথায় টুপি—কোরান পড়ছে।

বাতাসে ঠান্ডা মিশেছিল।

সুপুরি কুচোনো ছেলেটির পাশে স্যান্ডো গেঞ্জি আর নীল লুঙ্গি পরা যে স্বাস্থ্যবান মানুষটি, সে এবাড়ির বড় জামাই—এমনটি আনসার জানতে পারল এখনই। মেয়ের বাবা যেন ফিরলেন কোত্থেকে। হাতে ছাতা। পরনে লুঙ্গি-শার্ট। দিন ধরার দিনেই মানুষটিকে চেনা ছিল। ঢুকেই সালাম আলেকুম বললেন।

আনসার সঙ্গে সঙ্গে সালাম ফেরত দিল।

স্টিলের ডিশ এলো গোটা চারেক। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিলমচি—হাত ধোয়ার জায়গা। প্রত্যেক ডিশে চারটে করে জিলিপি। চারটে করে দানাদার। খিদেয় রাগ বাড়ছিল আনসারের। কিছু করার নেই।

মিষ্টি আসা মাত্র খেতে লাগল। অনজুমানের প্লেটেরও সব মিষ্টিই প্রায় খেল আনসার। তারপর পানি। এরপর চা আসবে, এমনটি শুনতে পেল কথায় কথায়।

অনেকটা নিচু উঠোনে কেটে দেয়া নালি দিয়ে বর্ষার জল ধীরে বহে যাচ্ছিল। চৌকিতে বসে যে গোয়াল দেখা যায়, সেখানে গোরুরা ভিজে গা থেকে মশা ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল। নারকেল পাতা ছাওয়া বাঁশ খুঁটির নিচু রান্নাঘর রাস্তার ওপারে। সেখানে হালকা অন্ধকার। ওটা কি এবাড়ির রান্নার জায়গা? মনে মনে নিজেকেই জিগ্যেস করল আনসার।

আর তখনই কাদাওঠা, পেছল উঠোনে ধড়াস করে পড়ল এবাড়ির বড় জামাই, যেমন পড়ে কাটা তালগাছ। চৌকিতে যারা বসেছিল সবাই বেশ জোরে হাসল। শুধু জাকাত আর আনসার হাসতে পারল না। নতুন কুটুম বলে কথা।

বড় জামাই থুবড়ে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারছিল না। একটু চেষ্টা করে উঠে বসলে তার শাদা স্যাণ্ডোগেঞ্জি, নীল লুঙ্গিতে কাদা-বাহার।

চৌকিতে বসা কে কে যেন বলে উঠল—আবাদে জামাই ওরকমই হয়!

আবাদ অঞ্চলের দিকে থাকে বলে 'আবাদে'। শব্দটি আনসারের জানা ছিল। মেয়ের বাবা নির্বিকার মুখে লুঙ্গি চাইছিল। বড় জামাইকে দিতে হবে। শালাদের কে একজন বলল, সব লুঙ্গি ভিজে। আমারটা প্যান্ট পরে খুলে দিচ্ছি।

মিনিট দশ বারোর মধ্যেই স্নান সেরে, লুঙ্গি পালটে, চুল আঁচড়ে বড় জামাই আবার এসে বসল চৌকিতে। তখনও জাঁতিতে অবিরাম সুপুরি কাটা চলছে।

রাস্তার ওপারে বাঁশের খুঁটি নারকেল পাতা মাথায় নিয়ে রান্নাঘর হয়ে দাঁড়িয়ে। সেখানে মেঝে খোঁড়া উনোনে অ্যালুমিনিয়ামের কড়া চড়েছে দেখতে পেল আনসার। তার নিচে প্যাঁকাটির আগুন। কিছু ধোঁয়াও ছিল। তবে কি রাতের খাওয়া এখানেই—ভাবতে ভাবতে নিজের ভেতরে আকাঙ্ক্ষার জল টেনে নিল আনসার।

অনজুমানের ঘুম পেরেছে। পড়ে যাওয়া জামাইয়ের ছবিটি মনে

করতে পেরে জাকাত আপন মনেই মুচকি মুচকি হাসছিল।

চা এসে গেছে কাপে কাপে, সঙ্গে বিস্কুট।

সবার আগে চায়ের কাপ তুলে নিল বড় জামাই। তারপর ঠোঁট দিয়ে চা চুষে নিতে নিতে বলল, এখানকার নোনা মাটি তো, বুঝতে পারিনি। হাওয়াই চটিতে বুড়ো আঙুলে যতটা চাপ আমাদের দেশে দি, এখানেও তাই দিয়েছিলাম। হলো না। পা ফসকে গেল।

চায়ে চুমুক দেয়া জাকাত হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেল।

আনসার গম্ভীর। খালি কাপ নামিয়ে রাখল চৌকির ওপর।

এবাড়ির মেয়েরা কলসি হাতে জল আনতে গেল ওদিককার সিঁড়ি দিয়ে। তাদের সবার পরনেই ফ্রক।

দোলায় বাচ্চারা দুলছিল। দুলবার জন্যে একটু আধটু মারা-মারিও করছিল। তাদের কারোর কারোর আনন্দ বাড়িতে দুদিন জেনারেটারে আলো জ্বলবে। অন্ধকার থাকবে না।

জাকাত বলল, ভাবিকে একবার দেখব।

ঘড়ি দেখছিল আনসার, নটা বেজে সাত মিনিট। তার পলিথিন বডি টাইটান কোয়ার্জ-এ সঠিক সময় আটকে থাকে।

যে চৌকিতে তারা বসেছিল, তারই উল্টোদিকে, সাজানো সব ক্যালেণ্ডারের নিচে যে দরজা, সেখান থেকে মেয়েদের গলা আবছা মতো কানে আসছিল। আসগরের ভাবি-বৌ হয়ত এখানেই।

কনে এলো একটু পরে। ছোটখাটো, ঘোমটা দেয়া। হাত বেশ ফরসা। পাতায় মেহেন্দীর ছোপ। ওর ছোট ভাই বলল, বুবুর শরীরটা ঠিক নেই!

জাকাত ভাবছিল এবার হয়ত ক্ষীর-খাওয়ানি হবে। কেউ এ ব্যাপারে কোনো কথাই বলল না।

কনের সঙ্গে যে সব মেয়েরা ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে জাকাত বলল, যে হলুদ পাঠানো হয়েছে তা একুশবার লাগাতে হবে গায়ে। এটুকুই তার মনে ছিল।

জুম্মান বলল, আরও একটা শাড়ি দেওয়া নিয়ম, কিন্তু তোমাদের বাড়ি থেকে পাঠায় নি।

জাকাত বলল, আমি বাড়ি গিয়ে বলব।

লম্বাটে, ধান কাটা বাদুলে-পোকা বাতাসে খারাপ গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

এবার অনুজমান একটু একটু তাড়া দিচ্ছিল বাড়ি যাওয়ার জন্যে।

আমরা এবার যাই। রাত হয়েছে। হালছাড়া গলায় বলল আনসার।

একটু খেয়ে গেলে হতো না! কনের বাবা একটু যেন থতিয়ে গিয়ে বলতে চাইছিলেন এসব কথা।

না, থাক। অনেক দূরের রাস্তা। আনসার পরিবেশ হালকা করতে চাইছিল।

কনে ততক্ষণে চলে গেছে।

বাচ্চারা টিউব আলোর নিচে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে শুধুই আলো দেখছিল। জল আনা মেয়েরা ততক্ষণে ফিরে এসেছে।

আবার অনুজমানকে ঘাড়ে করে পিছল পথে হাঁটা। পেছনে জাকাত। এবার অবশ্য জুম্মানও আছে টর্চ নিয়ে।

প্যাণ্ডেলে ততক্ষণে মিলাত-এ-নবীর সুর উঠেছে। আনসার শুনতে পেল জেনারেটরে চলা মাইকে সুরে সুরে ভেসে আসছে—নুরের দোলায় চেপে নবী এলেন দুনিয়াতে········।

পুকুরের জল এখন সম্পূর্ণ স্থির।

কেবল ব্যাঙেদের লাফ-ঝাঁপ একই ভাবে চলছিল।

জুম্মান টর্চের আলো দেখাতে দেখাতে বলল, সাবধানে আসবেন আনসার ভাই। এদিকটায় বড় কাদা। আর পানিও থামে না।

কাল আসবেন কিন্তু। জুম্মানের এই শেষ বাক্যটুকু আগের কথা থেকে কোন অদৃশ্য নিয়মে যেন আলাদা হয়ে যায়।

আনসার এতক্ষণ মনে মনে ভাবছিল আমাদের ব্রহ্মপুরে যারা বিয়ের আগের রাতে ছেলের বাড়ি থেকে খয়ের-পাতা নিয়ে আসে, তাদের খাতিরের বহর দেখলে তোমাদেরই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। মনে হবে বুঝি বা নতুন জামাই-ই এলো। পেট পুরে ভাত-ডাল, কত রকমের তরকারি, মুরগির গোস্, ক্ষীর। আর এখানে····।

জুম্মান তখনও আঁধার-পথে টর্চের আলো দেখাচ্ছিল। রাস্তা লাফানো ব্যাঙেরা সেই আলোয় পথ হারিয়ে ফেলছিল।

আনসার দেখতে পাচ্ছিল তার অন্ধকারমাখা ছাইরঙা অ্যামবাসাডারটিকে। পার্টির গাড়ি—এখনও ডেলিভারি বাকি। সবে নতুন বডি রং হয়েছে।

পুকুরের পাড় থেকে মিলাত-এ-নবীর আওয়াজ ভেসে আসছিল।

ছয়

সোনাচিয়াড়ির মোড় পেরিয়ে ছোট চা-দোকানের সামনে, ভেঙে পড়া লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে দাউদ আলি মণ্ডল তবলিগ-জমাতের আমির-সাহেব হেদায়েত মোল্লার পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে তার গন্ধটুকু। হয়ত একটু ঠাণ্ডাও।

চা-দোকানে চ্যাংড়াদের ভিড়। আমির-সাহেব হেদায়েত মোল্লার পেছনে দাউদ আলি মণ্ডলের মতো আরও তিন চার জন। যাঁরা বিশ্বাস করেন এই পৃথিবীর—পার্থিব জীবন আসলে কিছুই নয়। কেয়ামতের দিনে নেমে আসা সূর্যের প্রখর আলোয় তাপে, গরমে, পসিনা—ঘামের সমুদ্রে জীবন যখন হেদিয়ে আসবে তখন তোমার কোনো আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র, মা-বাবা তাঁর পুণ্যের ভাগ তোমায় দেবে না। অতএব হে মোমিন মুসলমান, তুমি মসজিদে এসো। তুমি নামাজে এসো।

এই জীবন কোনো জীবনই নয়। মৃত্যুর পর যে অনন্ত জীবন, সেখানে বেহস্তে আমরা সবাই সুখে থাকব। তার জন্যে ইমানদার হওয়া দরকার, দীন হতে হবে, নয় তো দোজখের আগুনে…উঃ সে বড় ভয়ংকর! ছোট হয়ে আসবে কবরের মাপ, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে শরীরের সব হাড়। সে বড় যন্ত্রণা। সেই যে সাপ লোহার নখে কেয়ামত পর্যন্ত তুলে আনবে তোমায়, তার পর আবার সত্তর ফুট নিচে ঢুকিয়ে দেবে। তুলবে। এভাবেই চলবে। চলবে।

সেই সাপের নিশ্বাস যেখানে পড়ে, সত্তর বছর পর্যন্ত সেখানে ঘাস অব্দি জন্মায় না।

বাইরে অন্ধকার। ভেতরে হ্যাজাক। বিবিধ-ভারতী প্রচারতরঙ্গে সন্ধের গান। বিজ্ঞাপন-বাণী, তবলিগ-জমাতের আমির-সাহেব হেদায়েত মোল্লা কমবয়েসীদের নামাজে, মসজিদে আনতে চাইছিলেন। সালাম দিয়ে হেদায়েত মোল্লা বলছিলেন, বাবা সকল, তোমরা সবাই তো মুসলমানের ছেলে। নামাজ, রোজা ছেড়ে মুসলমান ইমানহারা হয়েছে। তাই তার এ অবস্থা।

কমবয়েসীরা তাঁর কথা তেমন করে শুনতে চাইছিল না। চা-দোকানের দরমা-বেড়ায় টাঙানো আমির খান, সালমান খান, মাধুরী দিক্ষিত, শ্রীদেবী জোলো-বাতাসে, হ্যাজাকের আলোয় মাঝে মাঝেই দুলে উঠছিল। নাচছিল।

হেদায়েত তেমন লম্বা নন মুঠ-ভর তবলিগি-দাড়ি—কাঁচায়-পাকায়। মাথার চুলে শাদা লেগেছে। সেটুকু যত্নে, টুপিতে ঢাকা। টুপির বাইরে চুল বেরিয়ে আসেনি। পায়ের পাতার গাঁটের ওপর লুঙ্গি, তুলে শক্ত করে কোমরে বাঁধা। হাঁটু অব্দি এইট্টি-টোয়েন্টি কাপড়ের শাদা পাঞ্জাবি।

দাউদ আলি লম্বায় অনেকটা। একইরকম টুপি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি। তবে তাঁর দাড়ি, মাথার চুলে শাদা ছোঁয় নি। চোখে বাহারি, সরু রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা আছে। তাঁর ছ ছেলে চার মেয়ের মেজোটি আনসার। ব্রহ্মপুরে তার গ্যারেজ—মিন্টু অটোমোবাইলস। সেখানে তাঁর আর এক ছেলে আক্রাম।

ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী—কতদিন দেখা হয় না। এই দুনিয়ায় কে কার! মাসখানেক আগে আনসারের সঙ্গে কামালগাজির বাড়িতে আমার দেখা হয়েছিল। বাতাসে তখন বেশ গরম। আনসার জানতে চাইছিল পোড়াখোলায় তার মেজোখালার মেয়ের বিয়েতে যাওয়া হবে কিনা!

যেতে হলে আগে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানো আছে। সেখানে কাপড় দেয়ার সওয়াল। তারপর বিয়ে পড়ানোর দিনে নিদেন পক্ষে একটা পেতলের বালতি নয়তো কাঁসার বাসন। আমায় আনসার জিগ্যেস করছিল, মেজোখালার মেয়ের বিয়েতে কী যাওয়া হবে?

আনসারের বুকে পুরনো ঘা। ওর মিন্টু অটোমোবাইলস-এর জমি লেখান নিয়ে। এরশাদ, আনসার, এরশাদের মা রোকেয়া বিবি —আমার শাশুড়ি কম গালাগাল খায় নি। তবু শেষ অব্দি ওটা হয়েছে।

আমি, দাউদ আলি মন্ডল প্রায় পঞ্চান্ন—ছেলের সওয়ালের জবাব দিতে পারি নি।—দ্যাখো, তোমরা ডাগর হয়েছ সব।

আনসারের চোয়াল শক্ত হয়েছিল এমন জবাবে।

আমি আর ওর দিকে তেমন করে তাকাতে পারি নি। মা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তবলিগ-এর ডাকে, এক কথায় কামালগাজির বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমেছিলাম। একেবারে এক চিল্লা, একচল্লিশ দিন।

তারপর আরও তিন চিল্লা—একশো তেইশ দিন। তারপর আরও—ঘুরেই চলা। সবার চেয়ে বড় আল্লাহ্। ওহে মোমিন মুসলমান, তুমি মসজিদে এসো। নামাজে এসো।

মা-র মাটি দেয়ার সময়েও আমি ছিলাম না। তবু তো সব হয়ে গেছে। তারপর কুলপড়ায় এসেছিলাম। এ পৃথিবীতো ময়লামাত্র। জীবনকে দীন আর ইমানদার করে নিয়ে চলো সেই শেষের দিনে। শেষ বিচারের দিনে।

সুর্মা টানা চোখে হেদায়েত হ্যাজাকের আলো লাগা চা-দোকানের পেটের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর গা থেকে জেসমিন-গন্ধী আতরের মৃদু সু-বাতাস ছড়িয়ে পড়ছিল হাওয়ায়।—আসুন, আপনাদের দীনের দাওয়াত দিচ্ছি, আমরা সবাই মসজিদে আসি। নামাজে আসি। ইসলামী-ভ্রাতৃত্বের—এক্রামুল মুসলিমিন—এই সহজ কথাগুলি হেদায়েত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছিলেন।

কমবয়েসীদের মধ্যে তেমন উৎসাহ জাগছিল না। তারা বোধহয় এড়িয়ে পালাতে চাইছিল। বিবিধভারতী প্রচারতরঙ্গে ভেসে আসছিল—ম্যায় তুঝে ছোড়কে কাঁহা যাউঙ্গা........।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে চা-দোকানের আড্ডাধারীরা একে একে কেটে পড়ছিল, নানা ছল-ছুতোয়। তারা জানে কলমা, নামাজ, এক্রামুল মুসলিমিন-এর মতো ছটা ব্যাপার নিয়ে তবলিগে গেলে সেই চিল্লার পর চিল্লা। হেদায়েত সামান্য হতাশ হচ্ছিলেন। আবার হচ্ছিলেনও না। তিনি বহুদিনের তবলিগ করা আমির-সাহেব। সেওতো প্রায় পঁচিশ তিরিশ বছর হয়ে গেল। তাঁর ছায়ায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাউদ আলি মন্ডল, সুলেমান নস্কর, সাব্বির ঘরামি, আতাউর হালদার, আহদাত সাঁপুই। অন্ধকারে তেমন ভাবে কেউ কারোর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না।

হেদায়েত তবু হাত ধরার মতো কচি মুখ খুঁজছিলেন। একজন ইমানদার—বিশ্বাসীকেও যদি খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর হাতটি ধরে মুসাফা করবেন। তারপর যদি এক চিল্লায় রাজি করান যায়।

রাত বাড়ছিল নিজের নিয়মে। এশার নামাজের সময় হয়ে এলো। হেদায়েত আর সময় দিতে পারলেন না। তাঁকে যেতে হবে। আমির-সাহেব—দল নেতার শরীর নড়ে উঠতেই বাকিরা এটুকু বুঝে নিতে পারে। কবরের আজব, দোজখের আজব, কেয়ামতের আজব, হেদায়েত

কিছুই বলতে পারলেন না।

ঠিক তখনই পোড়াখোলায় মেজোখালার বাড়ি নিজের বাজাজ-চেতক-এর পিঠে প্রায় উড়ে পৌঁছে গেল আনসার। পথে সামান্য বৃষ্টি ছিল। আকাশে এখন মেঘলা ভাঙা চাঁদের আলো—ঘষা কাচের ওপার থেকে দেখানো টিউবের আলো বুঝি। উঠোনের কোণে বেঁটে টগর গাছ শাদা করে ফুল আর ফুল। পাশে যেন বা হলুদ কলকে ফুল ভারে অবনত লম্বা মতো, একা দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি। তার থেকে হয়ত ফুল পড়ল। অন্ধকারে আমের সবুজ পাতায় পাতায় বৃষ্টির দাগ। কাঞ্চন ফুল, কামিনী ফুল, গন্ধরাজ, কাঠগোলাপ—সবই এক সঙ্গে ফুটছে এই বৃষ্টি ধোয়া জ্যোৎস্নায়—একটু দূরে দূরে। তাদের সুঘ্রাণ বাতাসে।

উঠোনের মাঝে মনোয়ারা হালদার, ডাক নাম মনো। ক্লাস নাইনের পর আর পড়া এগোয় নি। শাদা রজনীগন্ধার সরু মালা, জরি দিয়ে ঘেরা একটি, ছোট, উঁচু, রঙিন কাপড়ের স্টেজ। তার মাথায়, ভেতর দিকে সাজানো রঙিন বেলুনের গোছা।

এটুকুর ভেতরই টিউব গোটা তিনেক, তার আলোবাহার বাদলা-পোকাদের ডেকে আনতে পেরেছে। মনোয়ারা লাল পাড় কোরা শাড়ি পরে পা মুড়ে, অনেকটা যেন হিন্দুদের সরস্বতী ঠাকুর হয়ে বসে। পাশে বক্সে দ্রাম দ্রাম বিট-এ মাইকেল জ্যাকসন। প্যাণ্ডেলটিও সেরকমই যেন। ব্রেক নাচের জন্যে তৈরি হচ্ছে কেউ কেউ।

উঠোনে কচি-কাঁচা, মেয়েদের ভিড়। ত্রিপলের নিচে উঠোনে—মাটিতে বিশাল বিশাল উনোন খুঁড়ে পেতলের বড় বড় হাঁড়িতে ভাত, গোসত্, ছোলার ডাল, আলু-কুমড়োর তরকারি। মনোয়ারার বড় বোনাই—জামাইবাবু ভালো রাঁধেন। তিনিই সব ব্যবস্থায়।

ছোট প্যান্ডেলে মনোয়ারা বসে। তাকে ঘিরে বাচ্চারা। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলছিল মাঝে মাঝেই। ছেলের বাড়ি থেকে খয়ের-পাতা—গায়ে হলুদ এসে গেছে। এখন মনোর ক্ষীর-খাওয়ানি।

বাজাজ-চেতক থামার শব্দে বাচ্চারা একটু চকিত হলো। ব্যাক সিটে বসে ছিল আক্রাম। তার হাতে পাতলা শাদা কাগজ মোড়া মাঝারি সাইজের পেতলের বালতি। আর একটা শাড়ির প্যাকেট। দেড়শো টাকার ওপরে দাম বালতির। শাড়ি দুশো। আক্রাম আনসারকে

তেমন করে কেউ নজরও করল না। রান্নাঘর থেকে পরিষ্কার ঢাকনায় ঢাকা খাবার আসছিল মনোর জন্যে। চালের আটার রুটি, ছখানা, ভাঁজ করা একপাশে। হলুদ বিরিয়ানি। একটা শ ছয়েক ওজনের আস্ত পোনা মাছ ভাজা। ঐ বিরিয়ানির চুড়োর ওপর। শাদা চিনা মাটির আলাদা আলাদা বাটিতে মুরগি-গোসত্, গোরু-গোসত্, ছোলার ডাল, সিমাই, নারকেল পিঠে। পাশে স্টিলের থালায় নারকেল দিয়ে তৈরি যেমনটি আমাদের মনুষ্য-হৃদয়—সেই 'পান' শেপের একটি জমাট মিষ্টান্ন। তার গায়ে কিশমিশ দিয়ে লেখা মনোয়ারা, হাফিজ।

মনোয়ারার ভাবি বরের নাম হাফিজ এটুকু আনসার কাছে এসে ঐ মিষ্টান্নটিতে নজর দেয়ার পর বুঝতে পারল। তার আগে সেও তো মুখে মুখে শুনেছে ছেলের বাড়ি নতুন হাট। তার টেলারিং-এর দোকান। বাবার অনেক আছে। ছেলে ক্লাস টেন ফেল।

এত কাছে এসেও আনসার-আক্রাম নিজেদের কাউকে দেখিয়ে উঠতে পারছিল না। ডবল বক্সে মাইকেল জ্যাকসন ফুরিয়ে গিয়ে 'পাপা কহতে হ্যায় বড়া নাম করে গা·······।'

ভিজে ওঠা উঠোনে গোস্-ভাত, তরকারি, ছোলার ডালে রাতের খাওয়া সারার ব্যবস্থা। শাল পাতার ওপর ধোঁয়া ওড়ানো ভাত। বড় বড় গোসের টুকরো।

মনোয়ারার ডান দিকে স্টিলের জগ, তাতে পানি। হাত ধুয়ে পানি ফেলার চিলমচি। পাশে স্টিলের ছোট রেকাবিতে ক্ষীর-খাওয়ানির পর দেয়া টাকা রাখার ব্যবস্থা। হাত ধুয়ে মোছার নতুন ডি সি এম তোয়ালে।

আব্বা আমায় তর্কে তর্কে বলেছিল, এসব দেয়া থোয়া সব ইসলামী মতে না-জায়েজ। কি দরকার এসবে! তোমরা যাও, খাও—ঠিক আছে!

আমি তো তেমন জোর দিয়ে বলতে পারি না। তাহলে আরও জোর ঝগড়া হবে। মায়ের অশান্তি, অপমান বাড়বে। না-জায়েজিতো অনেক কিছুই বাবা, তবু সেসবও তো আমরা করি। আবার ধর্মের দোহাইও পাড়ি। ক'জন ফেত্রা, জাকাত মন দিয়ে মানি! হজ যাওয়ার আগে নিজের চল্লিশজন প্রতিবেশীর আর্থিক অবস্থা যদি ঠিক থাকে, তাহলেই যাব—এমন বিধান কি আমরা সবাই অনুসরণ করতে

পেরেছি! আমরা সবাই কি সত্যি সত্যি মহান হজরতের কথা মতো দীন, ইমানদার হতে পেরেছি?

আনসার এ সব কোনো কিছুই গুছিয়ে বলে উঠতে পারছিল না। তবু তার মনে হচ্ছিল শ্রদ্ধেয় নবীজি যে ধর্ম দিয়ে গোটা আরবজাতিকে এক করে মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন তার কোথাও তো কুসংস্কার, জ্যোতিষ, মাদুলি, তাবিজ, ফুঁক নেই। তবু তো চার পাশে ফুঁক-ফাকের রমরমা। কোন হাদিশ মতে মনোয়ারার আব্বাকে তিরিশ হাজার টাকা নগদ বরপণ দিতে হয় ছেলের বাজাজ এম-এইট্রি কেনার জন্যে! তার সঙ্গে ছ ভরি সোনা, খাট, ঘর সাজানোর জিনিস? এসব কি ইসলামী নিয়ম-কানুনে জায়েজ—সিদ্ধ?

আব্বা দাউদ আলি মন্ডল ততক্ষণে অন্য কথায় ফিরে যেতে চাইছিল।

উঠোনের আরও ওপাশে ছাগল-গোরু থাকার জায়গা, তারও পরে পুকুর, পায়খানা। গোয়াল থেকে গোরুদের পা ঠুকে ঠুকে মশা তাড়ানোর শব্দ পেল আনসার।

জগের পানিতে হাত ধুয়ে, চিলমচিতে ফেলে, ডি সি এম তোয়ালেতে হাত মুছে ক্ষীর-খাওয়ানি পর্ব সেরে নিচ্ছিল পর পর সবাই। মনোয়ারার মুখে রুটি পাকানো একটু গোস্ দিয়েই দশ বিশ পঞ্চাশ—এমন টাকা ধরিয়ে দিচ্ছিল ওর হাতে।

উঠোনে চিলিবিলি করে খাবারে বসা বাচ্চারা কেউ কেউ বলছিল, মাদ্‌লি আছে, গোরু-গোস্ নেব না—এই আশায়, হয়ত বা তাদের জন্যে মুরগির মাংস বা মাছের টুকরো আসবে। সে প্রত্যাশায় ক্রমাগত বালি পড়ছিল। যারা খাওয়াচ্ছিল—পরিবেশনে, তারা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চাইছিল। মাঝে মাঝেই পায়খানার গন্ধ ভাসছিল হাওয়ায়।

এরমধ্যেই আনসারকে কে যেন বলল, ক্ষীর-খাওয়ানি করে নিতে। পেছনে আক্রাম শাড়ির প্যাকেট আর পেতলের বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

জগের পানিতে হাত ধুয়ে, চিলমচিতে ফেলে, ডি সি এম তোয়ালেতে মুছে আনসার শাদা কলাইয়ের বুকে লাল ফুল তোলা খান্‌চার দিকে তাকাল। বিরিয়ানি হাতে লাগবে, তা ভেবে নিয়ে রুটি ছিঁড়ে গোস্ দিয়ে এক টুকরো মনোয়ারার মুখে। সে একটু হাসল, মনোয়ারাও।

তার মনে পড়ল মনোয়ারার বড় বুবু—বড়দি আনোয়ারার বিয়েতে

পাতা মুড়িবেন না।

তারা তিন দিন তিন রাত টানা হৈ-চৈ-য়ে ছিল। সেও তো বছর পাঁচেক আগে। তখনও মিষ্টু অটোমোবাইলস হয় নি। জমি তার নামে লেখাপড়া করে দেয় নি মামা এরশাদ। খালু-খালা, খালাতো ভাই-বোনেরা, সবাই তাকে পছন্দ করে। এ ক' বছরে কী এমন পাল্টে গেল! পয়সা, জমি, দখল, ক্ষমতা, কি এতই কঠিন পাথর?

তোর মনে আছে মনো, আনোয়ারা-বুবুর বিয়েতে আমরা চাটু আর হাঁড়ির কালি নিয়ে বিয়ের দিন সকালে কী না কান্ড করলাম। শুরু করেছিলাম আমি-ই। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে আমায় চেপে ধরল বালির ওপর। মুখ লুকোতে চেষ্টা করলাম বালিতে। বাঁচা গেল না। কালিও লাগল, গালও ছড়ল। তারপর সেই কালি কেরোসিন ঘষে ঘষে তুলতে সারাটা দিন। আর আনোয়ারা-বুবু রফিক-ভাইয়ের সঙ্গে যখন ভাড়া করা শাদা কনটেসা চেপে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল তখন সঙ্গে নানি। আর ছোট নানি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাঙা ভিড়ের মধ্যে থেকে জানতে চাইছিল, মেয়ের নোটা গেছে তো!

সবাই কাঁদছিল। আমরাও। এ বাড়িটা তো তেমনই আছে। শুধু কয়েকটা ঘর বেড়েছে। ফেরার পথে দেখতে পাচ্ছিলাম শীতের স্তব্ধ পুকুর। একটা ছাগল ঘরের পথ ভুলে গিয়ে এত ভিড় দেখে বোকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফিরে এসেই বক্স-এ ওয়েস্টার্ন মিউজিক বাজিয়ে মিউজিক্যাল চেয়ার। আমি মিউজিক কনট্রোল করছিলাম। ঘুরে ঘুরে তোকেই ফাস্ট করছিলাম। তখন আমার তোকে খুব ভালো লাগে। একদিন রাতে স্বপ্নে....।

তারপর তো কত দিনই গেল। জমি লেখানো নিয়ে ঝগড়া, মুখ দেখাদেখি বন্ধ। তুই কত দূরে গেলি মনো—এসব ভাবতে ভাবতে মুরগির মাংসের ঝোলমাখা হাত জগের জলে ধুয়ে ফেলতে পারছিল আনসার। তারপর আক্রামকে বলল, ভেতরে গিয়ে শাড়ি আর কলসিটা খালার হাতে দিয়ে আয়। আমি এখনই যাব।

মায়ের সঙ্গে দেখা করবি না, মা তো আসছে! আক্রাম শুধু এটুকু জিজ্ঞেস করেই মেজদা রেগে গেল কিনা বুঝতে পারল না।

না, তুই যা। আমি যাব না। আনসার তেমনই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল।

—দুটি খেয়ে গেলে হতো না, এমনটি বলতে গিয়েও আক্রাম থমকে গেল। সে তার মেজদার মেজাজ জানে।

মনোয়ারা-মঞ্চের আলো যেখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে, সেখানে দল বাঁধা ছেলেপিলের দাওয়াত খাওয়া ভিড়ের এককোণে ইয়াসিন-পাগলা একা একা খেয়ে যাচ্ছিল। ব্রহ্মপুর, নোনাচিয়াড়ি, নতুন হাট, পোড়া-খোলা—সব জায়গায় মুসলমান বাড়ি তার অবাধ নেমতন্ন। হালইকরদের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে হাজির হয়। ক্লাস টেন ফেল। পেটের খোল সহজে ভরে না। বিয়ে বাড়ির দাওয়াতে বসে মোর সুইটস, মোর কার্ডস, মোর সফট বিফ বলে সকলের হাসির পাত্র হয়।

আক্রাম জানে মেজদার একথার ওপর আর কথা চলে না।

আনোয়ারা-বুবু কোলে একটি বাচ্চা নিয়ে রান্নার জায়গায় ত্রিপলের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গালে একপাশে টিউবের আলো। ফর্সা মুখে মেচেতার ছোপ। চুল উঠে উঠে সামনের দিকটা পাতলা হয়ে গেছে। দু হাতে অনেকগুলো কাচের চুড়ি। বুবুর বর রফিক-ভাই রান্নার কাজে ব্যস্ত। কাল গোটা গোটা ডিম ভাজা দেওয়া হবে বরযাত্রীদের পাতে। রফিক-ভাই এখন থেকেই কয়েকজনকে সে কাজে ভজিয়ে রাখতে চাইছে। পেঁয়াজ ছেলা, আলু ছেলা, ডিম ছেলা, গোরু-গোস্, মুরগি-গোস্ রেডি করা সারা রাত ধরে।

আনোয়ারা-বুবুও কি আমায় চিনতে পারল না? নাকি সবাই একরকম? নিজেকেই নিজেকে খুঁড়ে চলল আনসার। তারপর খানিকটা এগিয়ে রাস্তার ওপারে অন্ধকারে দাঁড়ানো বাজাজ-চেতকের কাছে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল কখন যেন আক্রামও তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইয়াসিন-পাগলার তখনও খাওয়া হয় নি। পুরো তিনটে ব্যাচ শেষ হতে চলল। এখন তো মুরগি, মিষ্টি, দই, পোলাও, বিরিয়ানি—কিছুই নেই। যে ফাজিল ছোকরা, বাচ্চারা তার পেছনে লাগছিল, ইয়াসিন তাদের দিকে না তাকিয়েই বলে দিতে পারছিল—স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলিতে এমন করা ঠিক নয়!

তার কথায় খেতে দেয়া, নেমন্তন্নে বসা সবাই, এমন কি উঁচু স্টেজে বসা মনোয়ারাও হেসে উঠেছিল। তার সামনে খান্চায় ততক্ষণে ছেলের মায়ের পাঠানো ক্ষীর রেখে গেল যেন বাড়ির কোনো মেয়ে।

সাত

গড়িয়ার দিক থেকে মধুবনের পেছনের রাস্তায় উড়ে আসতে চাইছিল আনসার। গড়িয়ায় ডবল চেসিস, চাতাল, মাডগার্ডের ঢাকনি—কিছুই মনমতো হলো না। ডবল চেসিস না হলে পার্টির কাজ হবে না। 'মধুবন' হলের পেছনের রাস্তার ওপর ছোট দোকান। আনসার তার পছন্দ মতো চেসিস বার করাতে চাইছিল। একটার দাম দেড়শো। লোহার যা দাম হয়েছে! একটা চাতালের দাম তিরিশ টাকা। এসব মাল স্কুটারে যাবে না। তার জন্যে টানা রিকশা ফিট করে আনতে হয়েছে ব্রহ্মপুর জামে মসজিদের সামনে থেকে। রিকশা মাল নিয়ে রিকশার মতো গ্যারেজে চলে যাবে। আনসার আনসারের মতো।

একটা কাঁচা রসিদ ধরিয়ে দিতে চাইছিল দোকানদার। সঙ্গে পাশের দোকানের ভাঁড়ের চা। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আনসার বিশাল বিশাল কৃষ্ণচূড়া দেখতে পেল। ফুল-ভার নেই। কৃষ্ণচূড়ার দিন শেষ হয়ে গেছে। গ্রীষ্ম, তারপর তো বর্ষাও কেটে এলো।

এখান থেকে হয়ে একবার মুর অ্যাভিনিউয়ের ওয়ারলেস।

সেখানে ঢোকার মুখে যে বকুল গাছটি, তা এখনও ফুলবতী। ছোট নুড়ি বেছানো পথের ওপর শাদাটে—ঠিক শাদাটে নয়, বোধহয় শ্বেত-পাথর রঙের বকুল, যেন বা ফুটি ফুটি তারার আলো। অথবা ভোরের শিশির ভেজা কোনো শাদা পাথরের কুচি।

ঝাঁট দিয়ে ফুল জড় করছিল একজন। লাল সিমেন্ট বাঁধানো বকুল গাছের গোড়ায় বড় বড় কালো নুড়ি-পাথর। তার গায়ে সিঁদুরের ফোটা, চন্দনের টিপ, ফুল।

যে অফিসারের সঙ্গে দেখা হলে নিজের বিল-বিষয়ক সমস্যাটির কিঞ্চিৎ সমাধান হতে পারে, তিনি টেবিলে নেই। ফলে দেরি হবে। বসতে হবে। আর দেখা হলে খুব ক্যাজুয়ালিই হয়ত শুনতে হবে—কীরে মোল্লার ছেলে, তোর তো অনেকদিন দেখা নেই।

আর এটুকু অপমান হাসিতে কথায় আনসারকে গিলে, হজম করে নিতে হবে—স্বাভাবিকতার নিয়মেই। সে জানে এখানে প্রতিবাদে

কোনো লাভ হয় না। কাজ আটকায় শুধু।

এখন বর্ষা নয়, তবু কোন ফাঁকে যেন এক ঝলক বৃষ্টি পৃথিবীকে চান করিয়ে দিতে নেমে আসে। লাল সিমেন্ট বাঁধানো বকুলতলায় ছাট বাঁচেনা। আনসার ছুটে পাথরের নুড়ি মাড়িয়ে, রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকের ফাঁকা গ্যারেজে ঢুকে পড়ে। সেখানে এখন কোনো গাড়ি নেই।

গ্যারেজে অ্যামবাসাডার পড়ে আছে—বডি রং করবার অপেক্ষায়। কাজ সেরে বিল করে দিলে পার্টির থেকে চার হাজার টাকা পাওয়ার কথা। স্কুটারও আছে দুটো। তাদের বডি রং—সাতশো করে। বর্ষায় রঙের কাজ হবে না। নষ্ট হয়ে যাবে। মিস্তিরি বসে থাকবে। রোজ দিতে হবে। কোটেশান, কাজ, বিল—এই চাকার ভেতর আমার জীবন ঢুকে থেঁতলে যাচ্ছে। এদিকে অফিসারবাবুর দেখা নেই। সিটে কখন ফিরবে, কেউ বলতে পারে না। বিল পাস হলে ম্যাকডোয়েলের বড় বোতল দিতে হবে। একে ওকে খুচরো-খাচরা বকশিশ।

বৃষ্টিতে রং-মিস্তিরি সুরেন দেবনাথ বসে থাকবে। রোদ্দুর না উঠলে গাড়ি রং-পালিশ কিছুই হয় না। এসব ভাবতে ভাবতে আনসার ওয়ারলেস গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে নিজের বাজাজ-চেতকে উঠে বসল। ততক্ষণে বৃষ্টি নেমে গেছে।

হাজরা থেকে বাজাজ-চেতকে গাড়ি প্রসাধনের নানা সামগ্রী—রং, থিনার, অয়েল, সারফেসার, রাবিন, ফ্রেঞ্চচক নিয়ে খুব জোরে ফিরছিল আনসার। একটা বাম্পারও কিনতে হবে। তার আজও কোনো হেলমেট নেই। টালিগঞ্জ মেট্রোস্টেশন বা হাজরা অব্দি হেলমেট ছাড়া একরকম ম্যানেজ হয়ে যায়। ট্রাফিক সেভাবে ধরে না।

রাজাবাজার থেকে সাইলেন্সার পাইপ, অ্যামবাসাডারের জানলার কাচ, ওয়াইপার, বা আরও কিছু আনতে গেলে হেলমেট নিতেই হয়। কিংবা শ্যামবাজারে বা মানিকতলায় বডি-মিস্তিরির খোঁজ করতে গেলে।

আজ জুম্মা—শুক্রবার। নামাজ পড়তেই হবে। সপ্তাহে ঐ একটা দিনই যা আনসারের নামাজ-পাঠ। বারোটায় আজান। পৌনে একটায় জমাত। বাড়ি ফিরে গা-ধুয়ে—গোসল করে, পাক—পবিত্র—কাচা লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে কানে তুলোমাখা আতর গুঁজে, চোখে সুর্মা টেনে আনসার

মসজিদে যাবে। মন ভালো থাকবে আতরের খোশবাইয়ে। ফেরেস্তারা নাকি দোয়া দেবে।

মামার বাড়ি উঠোনে এসে আনসার দেখতে পেল নানি কাঠের জ্বালে রান্না করছে। নানি আর মামির মুরগিরা মিলেমিশে কী কী যেন উঠোন থেকে খুঁজে নিতে চাইছে। মামাতো বোন অন্জুমানের খরগোশ-গিনিপিগের খাঁচা রোদে। অন্জুমান স্কুলে, মামা ব্যাঙ্কে, ছোট মামাতো বোন রিজিয়া কী একটা বায়না ধরে এক ঘেয়ে সুরে কাঁদছে।

সিমেন্ট বাঁধানো লম্বা, টানা বারান্দায় দুটি সোফা। গ্রিল ঘিরে রাখা বারান্দায় রোদে-ছায়ায় নকশা তৈরি হয়েছে। গ্রিলের ছায়া পড়েছে উঠোনে। উঠোনের এক কোণে পেয়ারা গাছটি বর্ষায়-রোদে রীতিমত স্বাস্থ্যবতী। ফলবতী। বছর পাঁচেক আগেও এই গাছের মাথায় হলুদ বেনে-বৌ পাখি দেখেছে আনসার। আজ তারা কোথায় যে উড়ে গেল!

নানি একটি মশলাদার কিছু রান্না করছে। দিন কয়েক আগে খালার মেয়ের বিয়ের আগের রাতে—ক্ষীর-খাওয়ানিতে না খেয়ে আসা, আর পরদিন বিয়েতেও না-যাওয়া—এসব নিয়ে নানির সঙ্গে খুব তকরার হয়েছে।

ও আনসার, একটু মুড়ির ছাতু খাবি?

এটুকুতেই আনসার আলি মণ্ডল জল হয়ে যেতে পারে। নানি ঘোমটা মাথায়, আগাগোড়া গা ঢেকে তার দিকে দেখছে। একটু ভারি মানুষ। বসলে উঠতে কষ্ট পায়। দু হাঁটুতে বাত।

সেই কবে পৈলান থেকে নানি—রোকেয়া বিবি এসেছিল তার শ্বশুরের ভিটেয়। তখন তার এতটুকু বয়েস। ব্রহ্মপুরে তখন খালি আগান-বাগান, সবুজ। একটা গোটা গাছ কাটলেই বাড়ির রান্না হয়ে যায়। সাতচল্লিশের দাঙ্গায় বাগবাজারে নানির খুড়শ্বশুরের জুতোর দোকান লুট হলো। ৬৪-র দাঙ্গায় যাদবপুরে, বাঁশদ্রোণীতে আমাদের আরও আত্মীয়-স্বজনের দোকান পুড়ল। ভয় পেতে শুরু করলাম আমরা। তাই নিজের কওম, বিশ্বাসকে আরও বেশি বেশি আঁকড়ে ধরা।

নানির বলা গল্পে এখনও কোনো প্রাচীন পুরুষ মৃত্যুর পর জীবনে ফিরে আসে। ততক্ষণে তার মৃতদেহ বিছানা থেকে নিচে নামান হয়ে গেছে। বেঁচে ওঠার পর দেখা গেল কারোর কোমরে শিকলের দাগ, কারও বা হাতের মুঠোয় ধরা খুদ।

এসব হয় কোত্থেকে? আল্লা যদি না থাকে, ধর্ম যদি না থাকে? পরকাল যদি না থাকে! বলতে বলতে ষাট পেরনো নানি রোকেয়া বিবি মুড়ির ছাতুতে জল আর চিনি দিয়ে দেয় আনসারকে। গব গব করে খাচ্ছে আনসার। এরপর গা-ধোয়া আছে। আর তখনই যেন বা শূন্য থেকে নেমে আসা হুর—এমনটি হয়ে উঠোন দিয়ে হেঁটে গেল আকিলের বিবি রহিমা।

চার বছর হল বিয়ে হয়েছে। এখনও বাচ্চা হয়নি। রহিমা সম্পর্কে আনসারের ভাবি। আকিল তার খালাতো ভাই। মায়ের খালাতো—মাসতুতো বোনের ছেলে। রোগা-পাতলা। নিজের ভি. সি. পি ভাড়া দেয়ার ব্যবসা আছে।

একটা ফুনাই মেশিন আছে আকিলের। এখন ফুনাই-এর ভি. সি. পি দশ হাজার তিনশো টাকা।

রহিমার বাপের বাড়ি খিদিরপুর। আকিলের বাড়ি কামালগাজি। রহিমা কেমন করে আকিলের হলো, তা তো আকিলের মুখ থেকেই শোনা যেতে পারে।

আমি আকিল হালদার, সাতাশ। পড়াশুনো ক্লাস ফোর। ভি. সি. পি চালাই। বাবা একটা ফুনাই মেশিন কিনে দিয়েছিল। তিন বছর ছবি দেখানোর পর তা একটু বেগড়বাঁই করছে। একটা ভিডিওকন ভি. সি. পি—তোশিবার সঙ্গে কোলাবরেশন, দাম তেরো হাজার দুশো চল্লিশ টাকা। রহিমাকে বিয়ে করার পর আব্বার কাছ থেকে এটাকা আর চাওয়া যায় না। আমাকেই কিনতে হবে ভি. সি. পি, মাসে মাসে টাকা শোধ দেব। তার জন্যে একজন গ্যারেন্টার দরকার। সরকারি চাকুরে।

কেমন বাজার যাচ্ছে আকিল?

এমন জিগ্যেস করলে আমি বলি, ভালোই তো। নতুন সিনেমার ক্যাসেট রিলিজ করলে যদি সে সিনেমা হিট হয়, তাহলে তার দাম ছশো থেকে সাতশো আশি। পরে দাম পড়তে পড়তে কখনও কখনও একশো আশিও হয়ে দাঁড়ায়। খুব কম হলে দেড়শ। সিজনে তিনটি বা চারটি ছবির ক্যাসেট সমেত মেশিন ভাড়া দিলে পাওয়া যায় পাঁচশ থেকে আড়াইশো। ডাল্ সময়ে ঐ ক্যাসেট আর মেশিনই একশো কুড়ি। সিজন টাইমে প্রতি রাতে একশো টাকা তো রোজগার হয়ই। তবে পয়সার জন্যে রাত জেগে রক্ত জল করতে হয়। নিজেকে থাকতে হয়। লোক দিয়ে

হয় না।

আব্বার স্বপ্ন ছিল আমায় একটা ফ্রিজ-টি. ভি. সারানোর দোকান করে দেবে কামালগাজিতে। কিন্তু রহিমাকে দেখার পর সব বদলে গেল।

আকিল এখানে নেই। তবু তো বার বার বলা তার কথাগুলো আনসারের কানে বাজছিল। মুড়ির ছাতু ফুরিয়েছে। রহিমা তার সামনের উঠোন পেরিয়ে মামির কাছে ভেতরে চলে যেতে চাইছিল।

আনসার খুব সহজে, যেন বা যে ভাবে মানুষ ছায়ায় দাঁড়ায়, তেমনই গলায় বলে উঠল ভাবি, এক গেলাস পানি দাও তো, বড় তেষ্টা পেয়েছে। তারপর নিজের ভেতরে নিজেকে শুনিয়েই যেন শুধু বলল, কেমন আছ রহিমা ?

রহিমা থমকে গেল।

এই চার বছরে আকিল তো আমাকে অপমান ছাড়া কিছু দেয়নি। কামালগাজির বাড়িতে শাশুড়ির সঙ্গে আমায় শুতে হয়। এখনও। আলাদা করে ঘর আজও হলো না প্রতি মাসেই শুনতে পাই বাড়িতে অনেক জায়গা, নতুন ঘর হলো বলে। সে আর হলো কই ! মাসের মধ্যে বাইশ দিন ভি. সি. পি মেশিন নিয়ে আকিল বাইরে রাত কাটায়। ঘর করতে গেলে টাকা লাগবে। চার বছরেও কী সেই টাকা হলো না !

রহিমা—তেমন লম্বা নয়, পাঁচ ফুটের মধ্যে। ফর্সা। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো। স্তন ও নিতম্বে পুরুষ-ডাকা ছন্দ তুলে কোনো কথা না বলে জল আনতে গেল রান্নাঘরে। হলুদ-লালের ছাপাশাড়ি শরীর বেড় দিয়ে ঘোমটা হিসেবে মাথায়। দু হাতেই কাচের চুড়ি। কপালে লাল বিন্দি টিপ।

রান্নাঘর থেকে জল নিয়ে আসা রহিমার হাত থেকে জল নিতে নিতে আনসার কী কী যেন ভেবে নিতে পারছিল। এই নারীকে সে তো আগেও দেখেছে। তবু তো এই জুম্মা পড়তে যাওয়ার আগে, গা-ধোয়ার আগের মুহূর্তে রহিমাকে কেন যেন নতুন মনে হলো। সে জানে রহিমা এখন এ বাড়িতে কয়েকদিন থাকবে। এটা তো আকিলেরও মামার বাড়ি।

খালি জলের গেলাস রহিমার হাতে ফিরিয়ে দিল আনসার। আঙুল বোধহয় আঙুল ছুঁলো। কি ছুঁলো না। রোদ পড়া বারান্দায় বিরতি-হীন কেঁদে যাওয়া মামার ছোট মেয়ে রিজিয়া। একটু দূরে নানি

দাঁড়িয়ে। রহিমা চলে গেল।

নামাজ সেরে মসজিদ থেকে বেরনোর সময় আনসার দেখতে পেল সিন্নির বাতাসা নেয়ার জন্যে রাস্তার ওপারে অনেক কচি বাচ্চার ভিড়।

আট

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে রহিমার কিছু করার থাকে না তেমন করে। আসলে বর্ষা চলে গিয়েছে। পর পর হিন্দুদের দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালিপুজোও। কদিন আগে ক্ষেত থেকে বেগুন আর ভিণ্ডির গাছ তুলে এনে রোদ্দুরে আরও শুকিয়ে নিয়ে জ্বালানী হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। এখন পুকুর পাড়ে সবুজ ঘাসের ভেতর ছড়ানো হাঁসের তুলো তুলো পালক—হাতে তুলে নিলে রেশম অনুভূতি। যেন বা নক্ষত্রমালা। ঘাসের মাথায় মাথায়, কচুর ডগায় হিম। পুকুর যাওয়ার রাস্তায় হাঁসের পায়ের দাগ। ভোরে গায়ে ঢাকা দিলে কখনও ভালো লাগে।

এক মাসের ওপর হয়ে গেল আমি ব্রহ্মপুরে। এর মধ্যে আকিল মাত্র দুবার এসেছে, তাও রাতে থাকে নি। একটা ভিডিওকন ভি. সি. পি কিনলে তার ব্যবসা ভালো জমে, সেজন্যে একজন সরকারি চাকরি করা গ্যারেন্টার খুঁজছে আকিল। তখন আরও পয়সা। রোজগার। আমাদের নতুন ঘর হবে। দেয়ালে কাবা-শরিফের ছবি। তাকের ওপর তুলে রাখা কোরান-শরিফ। দড়ি দিয়ে বোনা দোলনায় দুলে ওঠা, হেসে ওঠা খোকা।

চিরুনিতে উঠে আসা তেলমাখা চুল জানলা দিয়ে বাইরে নামানোর আগে থুথু দিল রহিমা। আকিল তো আমায় একরকম জোর করে চ্যালেঞ্জের মাথায় বিয়ে করল। কিন্তু আমি কোথায় তার হলাম! এসব ভাবতে ভাবতেই রহিমা 'সাজন'-এর গান শুনতে পেল। 'বহুত পেয়ার করতে হ্যায় তুমকো সনম/কসম চাহে লে লো, কসম চাহে লে লো খুদা কি কসম'।

এ গান শুনলেই গায়ের ভেতর কাঁটা দেয়। সিনেমাটা আমি দেখিনি। তবে গল্পটা শুনেছি। খুব হিট করেছে। এখনও চলছে 'মধুবন'-এ —আকাশ আর অমন—দুই ভাই। তারা এক মায়ের পেটের নয়।

ছোট বেলার বন্ধু। তারপর থেকে একদিন আমনের বাবা আকাশকে নিজের ছেলের মতো কাছে রেখে নিল। আর ওরা দুজনেই মাধুরী দিক্ষিতকে—

মৌলানা সাহেব বলেন, টি. ভি. দেখা, ভিডিও, সিনেমা দেখা না-জায়েজ। এক সময় রেডিও শোনাও এমন ছিল। আগেই বলেছি, আমি সাজন দেখি নি। গল্প শুনেছি। আমি বাংলা পড়তে পারি না। কবে যেন একটু আধটু আরবি শিখেছিলাম মসজিদে কোরান-শরিফ পড়ার মতো করে, তাও হাঁড়ির কালি তুলতে তুলতে, ঘরে ন্যাতা দিতে দিতে কবে যেন মুছে গেছে। এখন কিছুই আর মনে পড়ে না। শুধু রাগ হয়, লজ্জা করে। এই শরীর আমার কে নেবে? কে নেবে? আনসার, শাগির নাকি আকিল?

বাইরে স্কুটার থামার শব্দ। বোধহয় আনসার ফিরল। সট করে খিড়কি-দরজা দিয়ে শাগিরদের উঠোনে পেঁছিল রহিমা। সেখানেও মা-মুরগি। ডানার আড়ালে গোটা আট নয় বাচ্চা নিয়ে। বেলা পড়ে আসছে। ডুমুর গাছ ছাওয়া বন ধুঁদুলের লতায় এখন হলুদ হলুদ ফুল। শাগিরদের টালির চালে লতানো নবীন লাউগাছ। তাতে শাদা ফুল মুছে গিয়ে ফল ধরেছে, বেশ কয়েকদিন।

আমি আনসারের সামনে সোজাসুজি দাঁড়াতে পারি না। চোখে চোখ রাখলে ভেতরটা জ্বলা করে। কেন এমন হয়! আনসার ভাবি জল দাও বলে গ্লাস ছোঁয়ার স্টাইলে কতবার আমার আঙুল ছুঁয়ে চাপ দিয়েছে। এই পুরুষ-পেষণে আহ্লাদ হয়। দূরে সাজন-এর ক্যাসেটে ভেসে উঠল কুমার শানুর গলা—'মেরা দিলভি কিত্না পাগল হ্যায়'।

বাংলা পড়তে লিখতে না জানলেও হিন্দি গানের মানে বুঝতে পারি। ভালোবাসায় দিল কত যে পাগল। এই পাগলামি কি শুধু আমার গায়ের রং, মধুর হাসি, লাস্যময় ঠোঁট, ভারি স্তন আর পুরুষ্টু নিতম্ব ঘিরে? নাকি আমার মনেও কোনো কুসুম ফোটানোর আয়োজন!

হেমন্তে তপ্ত হয়ে ওঠা শরীরকে বাগে আনতে রহিমা বাথরুমে যায়। যেখানে শাড়ি সায়া ব্লাউজ একে একে ছেড়ে ফেলে চান-ঘরে চৌবাচ্চার গভীর জলরাশিতে সে নিজের উর্ধ্বাঙ্গ দেখে। বাহুমূল, স্তন, নাভি। আমায় কেউ নেয়ার নেই। এই যে নিজের ছায়া দেখা, নিজের নগ্ন

শরীর, যৌনতার কেন্দ্রগুলি দেখে নেয়া—এসবই তো হাদিশ মতে না-জায়েজ। তবু তো শরীর শরীরই। তা জেগে ওঠে।

ঘাড়ে মুখে মাথায় ভালো করে জল দিল রহিমা! চৌবাচ্চার পানিতে তার নগ্নতা ভাঙল অনেক, অনেকবার। ঢেউয়ে ঢেউয়ে। মগের ধাক্কায় এতো বেলায় তার গা ধুয়ে নিতে ইচ্ছে করছিল। জলের ঠান্ডা ধারায় তবু তো শরীর জুড়োয়। কিন্তু এই অসময়ে গা-ধুলে অনেকেই ভাবতে পারে সে কোনো না-পাক পুরুষ-সংসর্গে ছিল। লোক-নিন্দা, অপবাদের এই ভয় রহিমার আছে। চৌবাচ্চার সামনে জলে ভেসে ওঠা নিজের বিম্বিত নগ্ন শরীর দেখতে দেখতে রহিমা তার ওপর ছুরির বেগে প্লাস্টিকের মগ বসিয়ে দিল। ছবি গেল ভেঙে।

কপি ক্ষেতে চারা লাগানো হয়েছে। এসব জমিও আর দু'চার বছর পর থাকবে না, এখনই রাস্তার ওপর পঞ্চাশ হাজার টাকা কাঠা। শাগির তার ছোট ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে এ সবই ভাবছিল। আজ তার গাড়ির ডিউটি নেই। ইরাক-যুদ্ধের পর লাফিয়ে লাফিয়ে তেলের দাম বাড়ায় সপ্তাহে দিন দুই অফিস-অ্যামবাসাডার ব্যবহার করেন অফিস-বাবুটি। মাসে আট ন দিন ডিউটি করে চারশো হয় শাগিরের। বাকি ক'দিন ক্ষেতের কাজ, সিনেমা, হৈ-হুল্লোড়। হুল ডুবাডুব।

আমি শাগির আলি মণ্ডল আকিল হালদারের দূর সম্পর্কের মামা—রহিমাকে আমার ভালো লাগে। দূরে এখনও বক্সে বাজানো 'সাজন'-এর গান ভেসে আসছে। 'দেখা হ্যায় পহেলি বার/সাজন কি আঁখো মে পেয়ার'—কি নেচেছে মাধুরী এই সিনে! রহিমাকে আকিল নিতে পারে না। তবে কেন রহিমা আমার হবে না!

কপি ক্ষেতে জল দিতে দিতে শাগিরের মনে পড়ল বাড়ির সামনে অনেক প্যাঁকাটির বোঝা। সেগুলো ভালো করে শুকিয়ে তড়পা বেঁধে রান্নার জন্যে নিতে হবে। আর ক'দিন পর বঁটিতে 'পোন' হিসেবে খড় কুচোনো। এ সবের মাঝেও আমি রহিমাকে চাই। অন্ধকারে একদিন গজ করে হাত ধরে টান দিতে, সে তো মুঠো ছাড়িয়ে পালায়। জোর করে হয়ত চুমচাম খাওয়া যেত। সে আমি চাইনি। একটা মেয়েকে পেরে শুধু তার গায়ে ওঠাই কি সব? শুধু তো আমার রহিমাকে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে।

আমার অফিসবাবুর গাড়ি আনসারের গ্যারেজে। আমি তো

রহিমাকে একদিন আড়ালে বলেছিলাম, চলো না ডায়মণ্ডহারবার ঘুরে আসি। সাগরিকা হোটেল।

সে শুধু 'ছিঃ মামা' বলে আগুন ছড়িয়েছে আমার দিকে।

আমি তো আব্বাকেও বলেছি, রহিমাকে আমি শাদি করব। প্রথমটা শুনে আব্বা তো থ। এ ব্যাপারে আব্বা-মা সবাই দুঃখ পেয়েছে। তবু তেমন জোর দিয়ে কেউ না বলে নি। আর রহিমা এখনও অন্ধকারে পিছলে যাওয়া কোনো সুগন্ধী সাবান। মুঠো থেকে বারবার বেরিয়ে যায়। ধরা হয়ে ওঠে না। অথচ সুঘ্রাণ থাকে।

দূরে দূরে রোদ মুছে যাচ্ছে। বাতাসে শীত শীত। কপিরা এখনও তেমন আকার পায় নি। সারে, জলে, হিমে বড় হলে আবার আলো ফোটার আগে আগে তাদের কেটে নেয়া, বাজারের জন্যে। দেখতে হবে 'পাপোশ' লেগে খারাপ না হয়ে যায়! মসজিদ ছাড়ালেই এখন পাইকারি বাজার বসে। এতসব কাজের ফাঁকেও রহিমার হাতে এক গেলাস ঠাণ্ডা পানি বা এক কাপ গরম চা। শাগির আর কিছু ভাবতে পারছিল না।

অনজুমান আর রিজিয়া আপন মনে পুতুল খেলছিল সিমেন্ট বাঁধানো দাওয়ায়। এর মধ্যে অনজুমান আনসারকে বেশ ভয় পায়। মেজদা আসছে বলে অনেক সময় তাকে দু তিন গাল বেশি ভাত খাইয়ে নেয়া যায়। অনজুমান অনেক সহজ আক্রামের কাছে। রিজিয়া আনসারকে তেমন ভয় পায় না।

উঠোনে খাঁচাসুদ্ধু খরগোশ-গিনিপিগদের নামিয়ে দেয়া হয়েছে সবুজ ঘাসের ওপর। ডগা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলে ওদের শরীর ঠিক থাকবে। খাঁচার ভেতর কলাইয়ের বাটিতে কালকের রাতে দেয়া ভিজনো ছোলা। আপেলের ছোট একটা টুকরো।

আজ শনিবার। অনজুমানের স্কুল নেই। অনেকটা নিশ্চিন্ত রেহনা। স্টোভে সে নরম করে ডিম সেদ্ধ করছিল তার স্বামীটির জন্যে। ঘরের মুরগির দেয়া। কাল থেকে শাশুড়ির সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে আছে। বিষয় সামান্য। অনজুমানকে স্কুল যাওয়ার আগে কতটা ভাত খাওয়ানো দরকার। তাই নিয়ে রোকেয়া বিবি তাই একা একা তাঁর ঘরে।

ব্যাঙ্কে ইদানীং অ্যাটেনডেন্সের খুব কড়াকড়ি। সব ব্যাঙ্কই না শেষ অব্দি প্রাইভেট সেকটরে চলে যায়। যেভাবে প্রাইভেটাইজেশন ঢুকছে, এমনটি ভাবতে ভাবতে গরম ডাল দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত গিলে ফেলছিল এরশাদ। দেশি মুরগির ডিমের নরম কুসুম দিয়ে গরম ভাত, একটু সর্ষের তেল, নুন, লঙ্কা আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে মেখে খেতে অসাধারণ। এরশাদ তার সেই প্রিয় স্বাদে যেতে চাইছিল।

রেহনার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া হলে মাকেও যেন কিছুটা এড়িয়ে চলে এরশাদ। তাতে বোধহয় গৃহশান্তি তাড়াতাড়ি স্থিতাবস্থায় ফেরে।

ওল দিয়ে গোস্ত ওবেলা খাব। ফ্রিজে তুলে দাও। এটুকু এরশাদ রেহনাকেই শুনিয়ে বলে হয়ত। সে জানে মা তার এই প্রিয় রান্নাটি কাল বিকেলে করেছে। অথচ এখন তারিয়ে খাওয়ার সময় নেই। বাজাজ-সুপার-এ যেন বা উল্কা হয়ে তাকে পেঁছে যেতে হবে টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন। বাইরে গাড়ি রেখে কলকাতার পাতাল দিয়ে পার্ক স্ট্রিট।

মেট্রোর বাইরে গাড়ি রাখার জায়গা ফুটপাথ বদলেছে। আগে ট্রাম ডিপোর দিকে ফুটপাথে রাখা যেত। এখন উল্টো দিকে উত্তমকুমারের স্ট্যাচু ছাড়িয়ে কুদঘাট যাওয়ার রাস্তার মুখে।

আকাশে মেঘ বৃষ্টি নেই। তাই আর গাড়ি ঢাকার রঙিন প্লাস্টিক লাগে না। তবুও কেউ কেউ ধুলো বাঁচাতে ঢাকাটি দিয়ে থাকে। এরশাদ কোনো রকমে গাড়ি রেখেই মেট্রো স্টেশনের দিকে দৌড়ল। তার মাথার মধ্যে তখন বারে বারে বেজে উঠছে—দরওয়াজা বন্ধ হো রহা হ্যায়। দরোজা বন্ধ হচ্ছে। অগলা স্টেশন রবীন্দ্র সরোবর। পরবর্তী স্টেশন রবীন্দ্র সরোবর।

স্টেশনে পেঁছে ছাদ থেকে নেমে আসা টি ভি স্ক্রিনে চার্লি চ্যাপলিন নামের চিরকেলে ট্র্যাম্পটিকে ফুটে উঠতে দেখতে পেল এরশাদ।

নয়

জ্যোৎস্নার জলছাপ পৃথিবীতে নেমে এলে সব কেমন যেন দিক ভুল হয়ে যায়। সন্ধের পর এই যে ব্রহ্মপুর বাদামতলায় দাঁড়ালে দূরে দূরে আলোমাখা সবজি কেনাবেচা, সাইকেলের দোকান, ইট-বালি,চুন-সুরকি, মাসুদের গ্যারেজ, চা-দোকান, গোস্-ভাতের বন্দোবস্ত, বিন্ধ্যেশ্বরের তাড়ির দোকান, আম্মাদের জামাইয়ের চা-পরোটার দোকান, তারা ফার্নিচার্স, উমা ফার্নিচার্স, পুনম বেডিং স্টোর্স। আর হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল জেনারেটার আলো। শব্দ। তার জন্যে মাস ভাড়া। সম্ভবত তিরিশ টাকা।

এসব পেরিয়ে বটতলার দিকে যেতে গেলে আরও একটু আলো। ভিড়।

কুমড়ো যখন টেম্পো বোঝাই হয়ে এখানে নামে, তখন মনে হয় বুঝি বা গরম এলো। তখন মাদ্রাজী ওল, কাঁকরোল, ভিণ্ডি, ঝিঙে, কাঁচকলা, ডুমুর, পটল, মোচা। আবার শীতে বড় বড় ঝুড়িতে শাক-পেঁয়াজ, শালগম, বীট-গাজর, পালংশাক, মুলো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টোম্যাটো, থোড়, মোচা, ঝাঁকাবন্দী অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে, হিমে, প্রকৃতির ন্যাচরাল ফ্রিজে থেকে যায়।

তরকারি অথবা রোদের রং দেখেই এখানে ঋতু বদল টের পাওয়া যেতে পারে। আনসার এত কিছু জানে না কিন্তু আজ এই বিধুর জ্যোৎস্নার জলছাপের ভেতর সে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল রহিমাকে। লোডশেডিংয়ে বিদ্যুৎ পালিয়েছিল।

ছোটনানাদের গোয়ালের পেছনে, ডুমুর গাছ, গাছ বেড়িয়ে ওঠা হলুদ হলুদ ফুল ফোটানো ধুঁদুল-লতার পাশাপাশি জ্যোৎস্নায় রহিমা ছিল। তার এক পায়ের নূপুরটি খুলে কখন যেন পড়ে গেছে। সে কি এখানে?

রহিমার এক হাতে হারিকেন। একটু ঝুঁকে ঘেঁটু ফুল, ধুতরো গাছ, বন-কচু, ঢোল-কলমি, আকন্দ ঝোপের পাশে সে নিজের পায়ের গয়না খুঁজছিল। আর তখনই আনসার বটতলার দিক থেকে ফিরে তার গাড়িটি তুলে রাখার জন্যে ইট বাঁধানো গলি পথে ঘুরতে চাইল।

জ্যোৎস্নায় হারিকেন-আলোর অপার রহস্যময়তা। একটু নিচু হয়ে খোঁজার জন্যে রহিমার শরীর আরও স্পষ্ট হয়েছে। আকাশ-আলো তাকে আরও সুন্দর করেছে। আনসার তৃষ্ণায় ছিল।

এতো আমার আকিলের দেয়া নূপুর। তারপরই আকিল কি আমার —এমন জিজ্ঞাসায় রহিমা চাঁদের আলোর নিচে কেঁদে ফেলতে চাইছিল। আমার তো কেউ নেই, কেউ হলো না।

ভাবি—আনসার গম্ভীর উচ্চারণে রহিমাকে পেতে চাইছিল।

রহিমা কোনো জবাব দিল না।

ইঞ্জিনের স্টার্ট বন্ধ করে আনসার এগিয়ে এলো। তারপর এই গোয়াল ঘরের পেছনে গোবর, গো-চোনা, মশার সমবেত আক্রমণের মাঝে সে রহিমার হাত ধরল।

রহিমা একটুও চমকাল না। তবু তার শরীর ভঙ্গিতে কোথায় যেন অবজ্ঞা ছিল।—গা-ধার থেকে সরো। এমন মৃদু উচ্চারণে সে আনসারকে উসকে দিতে পারে।

কি হারালে?

পায়ের গয়না।

খুঁজে দেব?

তুমি এখন যাও, কেউ দেখে ফেললি···

চাঁদ সাক্ষী ছিল। ছোটনানার গোয়ালে, অন্ধকারে দেয়াল-ধারে রহিমাকে ঠেসে ধরেছিল আনসার। এটুকু পুরুষ-স্পর্শের বোধকরি প্রতীক্ষা ছিল।

গোয়ালের বাইরে শাগির শেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে আনসারের স্কুটার বন্ধ করা, গলার শব্দ, সবই তাদের খড় টাল দেয়া বারান্দা, খড় কাটা বড় বঁটির পাশ থেকে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছিল।

চাঁদের আলোয় খড় কুচোনো বঁটি তার ইস্পাত রং নিয়ে যেন বা কোনো হিম-ভয় হয়ে পড়েছিল। খড়ের গাদায় বসা একটি দুটি জোনাকি এই জ্যোৎস্নায় তেমন কোনো উজ্জ্বল রং পাচ্ছিল না।

শাগির প্রতীক্ষায় ছিল আনসারের হয়ে গেলে রহিমাকে নেবে।

গোয়ালের গভীরে, অন্ধকারে যৌথ শ্বাসপতনে, আশ্লেষের চাপা শব্দে, লজ্জাহীনতায় শাগির আরও উত্তপ্ত হচ্ছিল। অথচ তার প্রতীক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই।

নিজের শরীর কাপড়ে অন্তত ঢাকা থাকে, সেই সব শরীরী শাখা-প্রশাখাগুলি—যেখানে যেখানে পুরুষ লুব্ধ হয়, রহিমা নিরুপায় আনন্দে এমনটি করতে চাইছিল। অথচ আনসার তো প্রথমে ধর্ষণই চেয়েছিল। কিন্তু রহিমা তার শরীর-ভঙ্গিতে সেই বোধটুকু সরিয়ে দিতে পেরেছে। রহিমা হাদিশকে মেনে চলতে চাইছিল, সেইসব সুখ-মুহূর্তে, আব্রুর চিন্তায়। আর আনসার সব ভুলে যেতে চাইছিল।

আনসার প্রথমে উঠে বেরিয়ে এসেছিল। তার মাথার ঘন চুলে, পিঠের নিচে হেমন্তের খড়। রহিমার একটু লালচে মতো চুলে খড়, কাঠিকুটি হয়ত একটি জোনাকিও—ঝড় মুছে যাওয়া আকাশে যেমন একক সন্ধ্যাতারা।

শাগির আনসারকে দেখল, কিছু বলল না। শাগির তো পুরুষ হয়েই ছিল। দ্বিতীয়বার সম্পূর্ণ অন্য শরীর থেকে প্রহার নিতে রহিমার এখন আর আপত্তি করার কিছু ছিল না। শরীর সুখে ছিল, মন ছিল না-পাক-ই-র উদ্বেগে। শাগির তাকে দ্বিতীয়বার অন্ধকারে টেনেছিল।

হেমন্তের সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে, বড় বাথরুমে ঢুকে হুড়হুড় করে জল ঢেলে এই না-পাক শরীর, শরীরী গরম নামিয়ে দিতে চাইছিল আনসার। সঙ্গে সুরভিত সাবানের ফেনা ছিল। সুবাসিত শ্যাম্পু। হয়ত পা থেকে কোমর অব্দি ভেজালেও চলত—এমনই তো আমাদের সংস্কারে, জীবনের নানা পাতা থেকে শিখে নেয়া নিয়মটি। কিন্তু আনসার জামা-প্যান্টসহ পুরো চান করতে চাইছিল। বাথরুমেও নগ্নতা নয়, সবটুকু আব্রু।

বাথরুম দরজা ছাপিয়ে উঠে আসা জলের শব্দে রেহনা অনুজুমানকে জিজ্ঞেস করে—বাথরুমে কে রে? গা-ধুচ্ছে!

অনুজুমানের সহজ উত্তর, মেজদা।

আমার গায়ে ওয়াক্স পালিশ, থিনার, রং, পুডিং, ব্রহ্মপুডিং-এর গন্ধ ঘিরে থাকে, তার সঙ্গে ঘামের গন্ধ। খৈনির তামাক-চুনের গন্ধ। ক্বচিত টেনে নেয়া সিগারেটের গন্ধ। এখন এই সাবান, শ্যাম্পু, জল পেরিয়ে কি যেন এক গন্ধ আমাকে ঘিরে। সে কি রহিমার? সে কি ভালো-বাসার? সে কি শরীরের?

আনসারকে ধুইয়ে দিয়ে সাবান-শ্যাম্পু গোলা জল যেন বা বড় নিশ্চিন্তে বইছিল নর্দমা দিয়ে। গ্যারেজ, তালগাছ, সবজির ঠেক, ঘরে

ফিরে যাওয়া মুরগি-ছানা, মা-মুরগির পালক সবাই নিজের মতন।

আমি কি রহিমাকে ভালোবাসি, নাকি শুধুই তার শরীর? শাগির যখন তাকে টেনে নিয়ে যায়, আমি তো কিছু বলি না? সে কি শরীর-সর্বস্বতায়, নাকি লোক-লজ্জার ভয়ে? এমন জিজ্ঞাসা আনসারকে পেড়ে ফেলতে পারে না। সে শুধু আজকের এই যৌনতা, যৌনতা-মুক্তির থেকে নিজেকে লুকোতে চায়। সমাজ বলে তো একটা কথা এখনও আছে।

অথচ আমি গড়িয়া থেকে খারাপ পাড়ার মেয়ে আকলিকে এনে শরীর মেটাই। তখন আমার সঙ্গে আব্বাস। আকলিকে এর পরে একদিন রিকশায় চড়ে ব্রহ্মপুর, বাদামতলা দিয়ে যেতে দেখে ধরে টেনে নামাই। তখন আমার ইচ্ছে ছিল। আমার সঙ্গে শাগির। আকলি রাজি হয় না। তার অন্য পার্টি কনট্রাক্ট আছে। আমায় বলে, এদিকে গোস্ খেতে এসেছি।

আমি আর শাগির দুজনেই তাকে থাপ্পড় লাগাই। আকলি খিস্তি দিচ্ছিল। আমরাও তাকে খিস্তি দিয়ে বলি, তুই এখানে কেন? ভদ্র পাড়ায়?

সে আমাদের বাপ-চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে। কেন আমরা তাকে একদিন গ্যারেজে তুলে আনতে চেয়েছিলাম, সেই জিজ্ঞাসায় যায়। এতে কেচ্ছা বাড়ে। ফলে নাগরিক কমিটি আমাদের ডেকে বিচারে বসে।

জলের শব্দ চিন্তা ছিঁড়ে দেয়।

বাইরে রেহনার গলায় আওয়াজ—ভাগ্না, গা-ধোয়া হলো। সন্ধে বেলা শীতে ঠান্ডা লাগবে যে।

গ্যারেজে যা তেল-কালি, ধুলো—শীতের অবেলাতেও সাবান দেখে চান না করলে—বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আনসার এসব যেন নিজেকে শোনাতে গিয়ে স্বগতোক্তির মোড়কে রেহনাকেই শোনালে।

আরও একটু রাত হলে এরশাদের লম্বা, টানা সিমেন্ট বাঁধানো বারান্দায় ডুমের আলোর নিচে আকিল গোস্-পরোটা খাচ্ছিল। পরিবেশন করছিল রেহনা। —ভাগ্না, তুমি কবে রহিমাকে নিয়ে ঘরে উঠবে—এমন প্রশ্ন রেহনা খুব সহজেই করে নিতে পারছিল।

আকিল মাথা নিচু করে খাচ্ছে। ডালডায় ভাজা ভাঁজ ফেলা গোল গোল পরোটা। সঙ্গে ভুনা গোস্ত। পুঁইশাক দিয়ে গোস্তের ঝোল।

হাড় ছাড়া গোস্ হামান দিস্তায় থেঁতো করে, অল্প মুসুর ডাল বাটা মিশিয়ে, আদা-রসুন-পেঁয়াজ বাটা, কাঁচা লঙ্কা-নুন দিয়ে ছাঁকা তেলে ভাজা ছোট ছোট টিকিয়া। আস্ত ডিম ভাজা। মাছ ভাজা। বেগুন ভাজা। পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে তৈরি ঘন ছোলার ডাল।

আকিল বেশি খেতে পারে না। সে আস্তে আস্তে পরোটা ছিঁড়ছিল, দু হাত দিয়ে পেখম মেলা ময়ূর ডিজাইনের সিনথেটিক মাদুরের ওপর রেহনার নিজের হাতে ফুল তোলা দস্তরখান। তার ওপর স্টিলের থালা-বাটি। পানির গেলাস। জগ। হাত ধোয়া জল, মুখের ছিবড়ে, হাড় ফেলার চিলমচি।

আর একটু গোস্ নাও আকিল!

নাহ্, আর পারব না মামি।

দূরে, রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রহিমা। যেন বা ছায়াবনতা। টানা ঘোমটায় হয়ত কিছু লজ্জা। কিছু ক্লান্তি।

খাওয়াও, খাওয়াও। ভাগ্নাকে ভালো করে খাওয়াও—ওকে তো আজকাল দেখাই যায় না! ব্রহ্মপুর কি ছেড়ে দিলি বাপ! বলতে বলতে লুঙ্গি, গায়ে চাদর জড়ানো এরশাদ এসে দাঁড়াল।

তা হ্যাঁরে, ওয়াসিম কী করছে? সেই ইট, বালি, লোহার রড, স্টোন চিপস-এর দালালি, মাটি বিক্রি! তাও তো ঠিক মতো করে না। এই তো আমাদের এই ব্রহ্মপুরে কতগুলো গুল কারখানায় মাটি দেয়ার কনট্রাক্ট করে দিলুম, তা কোথায় কি! মাটি কাটার নাকি লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সাপ্লাই নেই। অথচ অন্যদের মাল ঠিক আসছে। আমায় সবাই গাল দেয়।—কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে, অনেকটা যেন থিয়েটারি দমে বলে চুপ করল এরশাদ।

আকিল আসলে তার নতুন ভিডিওকন ভিসিপি-র গ্যারেন্টার হিসেবে থাকার জন্যে এর মধ্যেই এরশাদকে মনে মনে ভেবে ফেলেছে—শুধু প্রস্তাবটি দেয়াব প্রতীক্ষায় ছিল। তার আগেই এরশাদ বলে উঠল, আমি আর কারও ঝঞ্ঝাটে থাকব না। পয়সার মামলায় তো নয়ই।

বাঁ হাতে গেলাসটি তুলে জল খেল আকিল। তারপর একটু থেমে রেহনাকে বলল, একটু চিনি দেবে মামি, পরোটা দিয়ে খাব!

রেহনা আকিলের থালায় পরোটার ওপর চিনি নামিয়ে দিতে দিতে বলল, ভাগনা, এবার তুমি রহিমাকে নিয়ে যাও। পাঁচ জনে পাঁচ কথা

বলে। নতুন ঘর তুলে বৌ নিয়ে শোও, বস।

বাকি কথাগুলো শোনার আগেই কান্না চেপে রহিমা রান্নাঘরের দরজা থেকে সরে গেছে। তুমি আমায় কোনো দিনই নিয়ে যাবে না আকিল। ছল-ছুতোয় এখানে নয়ত খিদিরপুরে ফেলে রাখবে। এখানে সবাই তো মামাশ্বশুর, দেওর-ভাসুর। তবু তো আমার শরীর বাঁচে না। একটু দূরসম্পর্কের দুই মাসিরও বিয়ে হয়েছে এখানে। সেই খালাদের বাড়িও বা কদিন থাকা যায়! বিনা মাইনে, পেট-খোরাকির ঝি। গরীব আত্মীয়র কোনো কদর আছে! খিদিরপুরে গিয়ে থাকব কি! সেখানে তাদেরই কিছু জোটেনা। আব্বা মরহুম—নেই। মা, দুই বোন এক ভাই। কষ্টেসৃষ্টে চালায়। সেখামে আমি গিয়ে বসলেই আর একটা পেট। পেট বাড়লে গরীব মানুষ পথে বসে।

আকিলের খাওয়া হয়েছিল। রহিমা তাকে পান এনে দিল। চোখের জল তার আগে আঁচলে মুছে নিতে হয়েছে।

শোনো, এ মাসটা থাকো। এখন তো ভিসিপি-র সিজন। সেই ধর, বিশ্বকর্মা পুজো থেকে শুরু হয়েছে। দুর্গা, কালি, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, তারপর বিয়েবাড়ি। খুব দৌড়োদৌড়ি—টাকা। এই তো অমিতাভ-র 'অকেলা' রিলিজ করল। তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় 'লেকিন'। বিনোদ খান্না-ডিম্পল। ডিম্পল এখন যা আর্ট ফিল্মে কাজ করছে না। 'ইয়ারা সিলি সিলি' বলে একটা গান লতা যা গেয়েছে!

এটুকু বলে সে রহিমার কাছে যায়। তারপর, ওফ্—বলেই ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে একটি বিশেষ মুদ্রা করল আকিল। ততক্ষণে রহিমার চোখে আরও এক পশলা জল এসে গেছে। এটুকু গোপন করে অন্ধকার উঠোনের কোণে পেয়ারার গাছের সামনে হু হু কান্নায় সে নিজেকে ভেঙে ফেলল।

গ্যারেজের মিস্তিরিদের পেমেন্ট দিতে দিতে আনসার ঠিক তখনই বলে উঠল—কাল সকলে একটু সকাল সকাল এসো।

দুপুর রহিমার বড় হা-হা কাটে। নানা কাজের পর ভাত খেয়ে একটু গড়িয়ে নিতে হয়। শীত একটু বেশিই পড়ল। ছোট বেলার এই দুপুরে সবজির ঠেক থেকে বক্স-মাধ্যমে ভেসে আসা 'তুমসে মিলনে কো দিল

করতা হ্যায় বাবা'—'ফুল আউর কাঁটে'র এই গান শুনতে পেল রহিমা। পিচ রাস্তার ওপর দিয়ে কাপড় মোড়ানো টিনের বাক্স নিয়ে চুড়িঅলি যাচ্ছে। তার মুখে কোনো ডাক নেই। একটু আগে আছরের নামাজ হয়ে গেছে। সে-আজান শোনার পর মাথায় যেমন ঘোমটা ঢাকার নিয়ম, সে রকমই ঘোমটা ঢেকে বসেছিল রহিমা।

একবার শরীর পাওয়া হয়ে গেলে তার ওপর বোধহয় পুরুষের সহজ অধিকার জন্মে যায়। এমন দুপুরে শাগির রহিমাকে চাইছিল।

কই! তুমি তো আমায় আর বিয়ে করার কথা বলো না! মুফ্‌তে সব হয়ে যাচ্ছে—বড় চালু, না! নিজের মধ্যে এই কথাগুলো রাগে চিবিয়ে নিয়ে এক ঝটকায় হাত ছাড়াল রহিমা। বলল, আমি তোমার আব্বারে বল্‌ব। মেয়েমানুষের ওষুধ তুমি!

হাত ঝটকানিতে একটু পিছিয়ে শাগির বলল, আকিল তোমার সঙ্গে কাটান-ছেঁড়ান করে দিলেই আমি।

একথা তো আনসারও বলে····

আনসার আর আমি এক নই।

কুকুর, কুকুর সব। ছেলেমাত্রেই কুকুর। এখন যাও।

শাগিরের চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

আমি কোথায় যাই! আমার স্বামী আমায় নেয় না। দুজন পুরুষ আমারে নিয়ে খেলা করে। খেলতে খেলতে সর্বনাশের বাঁকে দাঁড়ায়। আমার কী হবে?

ক্যাসেট প্লেয়ারে আবারও 'ফুল আউর কাঁটে'—'ধীরে ধীরে পেয়ার কো বঢ়ানা হ্যায়।'—আমি আর পেয়ার শুনতে চাই না কুমার শানু, বালা সুব্রামনিয়ন, অনুরাধা পড়োয়াল, অলোকা ইয়াগনিক—তোমাদের সকলের ভালোবাসার গানের মুখে আগুন। আগুন। সব দোজখে যাও।

দশ

ছোটবেলায় আমরা ক্যাঁকলাশ দেখে মারতাম। ক্যাঁকলাশ যেন কী একটা অন্যায় করে, কাকে যেন শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। রহিমাকে জোর করে চুমু খেতে খেতে আনসার এইসব ভাবছিল। ক্যাঁকলাশ কাকে ধরিয়েছিল? নাম যে কিছুতেই মনে পড়ে না। সেই যে কোন এক যুদ্ধের পর ইঁদারার ভেতর লুকিয়ে ছিলেন কে যেন। হয়ত কোনো মহাপুরুষ—নবী হবেন। কুয়োর মুখটি আড়াল করেছিল মাকড়সা জাল বুনে বুনে। আর ক্যাঁকলাশ—গিরগিটি সেখানে কৌতূহলের উঁকি দিয়েছিল।

আমি কি সেই গল্প-কথার গিরগিটি। ভোরে, শীতের সূর্যের ঘুম ভাঙার এমন মুহূর্তে গোয়াল ঝাঁট দেয়া রহিমাকে জোর করে চুম্বনে আনল আনসার। কুয়াশায় চারপাশ অস্পষ্ট। রাস্তায় তখনও হ্যালোজেনের হলুদ। আবছা মতো অন্ধকার। রহিমার ঠোঁটে-জিভে পান্তাভাতের স্বাদ। শরীর তো বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাদে, গন্ধে বদলে যায়।

রহিমা ঠোঁট মুছছিল। ঘুরিয়ে পরা শাড়ি। গায়ে সুতির চাদর। চোখে আবছা সুর্মা। লালচে চুল এই ভোরে বুঝি বা আরও লালচে। পৃথিবীতে যেন কিছুই হয় নি। এমন ভাবেই রহিমা উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। ভোরের শালিক, কাক, চড়াই কখন যেন জেগে গেছে। রহিমা উঠোনের শুকনো পাতা জড় করছিল এক কোণে।

তুমিও আমায় নেবে না। আকিলও আমায় নেবে না। আমি শুধু ফলের গাছটি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। থাক, কারোরই দরকার নেই। দেখা যেন হয় জানাজা-নামাজ—জা-নামাজ-এর সময়। সেই ভালো।

আনসার কি যেন একটা হালকা রসিকতা করে হাসতে চাইল। ঝাঁট দিতে দিতে রহিমা ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে।

ইট বাঁধানো উঁচু রাস্তা থেকে নেমে আনসার দেখতে পেল যুব কল্যাণ সমিতি, সবজির ঠেক, বোড়াল, নতুন হাট যাওয়ার রাস্তা—সবই এখনও ঘুমে। শুধু কয়েক দিন আগে জন্মানো কুকুর বাচ্চাদের কেউ

কেউ চোখ ফুটে রোদ খুঁজতে রাস্তার দিকে এসে পড়েছে। শীত করে ওঠায় তাদের কুঁই কাঁই চিৎকার বেড়ে উঠছিল আরও।

—ধ্যাস সোগো—ঘুম থেকে কেউ ওঠেই নি। আম্মাদের জামাইয়ের চা-দোকানে গেলে এক কাপ গরম-পানি অন্তত পাওয়া যাবে। সকালে এটুকু গরমই তো যথেষ্ট। আনসার এমন ভাবনায় নিজেকে মুখ ঘুরিয়ে বটতলার দিকে নিয়ে চলল।

চায়ের দোকানে আব্বাস ছিল।

এর মধ্যে কয়েকদিন আব্বাসের সঙ্গে দেখা ছিল না। বিশেষ করে সেই আকলি-কাণ্ডের পর, নাগরিক কমিটির বিচারে আমাদের তিনশো টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল আকলিকে। আব্বাস অবশ্য সে কেসে আমার সঙ্গে ছিল না, শাগির ছিল। কিন্তু যেহেতু নাগরিক কমিটির দাদাদের কারোর কারোর সঙ্গে আব্বাসের ওঠাবসা, তাই আমি একটু ক্ষোভে ছিলাম। আব্বাস এ সময়টাতে আমাকে দেখল না!

বাঁধ ভাঙল বিশ্বকর্মার পুজোর আগের রাতে। না-জায়েজ, কাফেরি, সেরেক—পুজো না করলেও ম্যাকডোয়েলের তিনটে বোতল খোলা হয়েছিল।

রং-মিস্তিরি সুরেন দেবনাথ, বডি মিস্তিরি রতন, কৈলাস—সবাই বলছিল, মাল দিয়ে ঠাকুরকে চান করাব।

—গুরু তুমি ঠাকুর আনো না আনো, বোতল দাও।

আনসার বুঝেছিল তার গ্যারেজে বিশ্বকর্মা ঠাকুর আনার বায়না, পুজো করো—যা প্রথম দিকে খুব জোরদার ছিল—নইলে আমরা কাল থেকে তোমার গ্যারেজে কেউ কাজ করব না, এখানে পুজো নেই—এই দাবি ঠেকাতে না-জায়েজ মদের বোতল জরুরী ছিল। বক্সে প্রবল জোরে বেজে ওঠা 'দিল হ্যায় কি মানতা নহি'-র ক্যাসেট। হাতে হাতে গেলাস। সে রাতেই আব্বাস কখন যেন নতুন করে আমার বন্ধু হয়ে গেল।

রাতভ'র জুয়ার বোর্ড বসিয়ে রোজগার—তা প্রতি বোর্ডে প্রায় পাঁচশো টাকা, এ ছাড়া যে জিতল তাদের থেকে আলাদা পেমেন্ট। লোকাল মাঠ থেকে মাটি কেটে পার্টি ফিট করে বিক্রি করা, ইদানীং রাস্তার পাশে তৈরি হওয়া পাকা নর্দমার মাটি নিয়েও তো এক ক্যাচাল। আব্বাস সেখান থেকেও অনেকগুলো টাকা খেল। বাজারে নতুব তর-কারিঅলা, মাছঅলা বসানো, ভাড়াটে তোলা—এমনি নানান কাজে

আব্বাসের দু পয়সা। তার তো সারা রাত পড়ে থাকে এ সন্ধের জন্যে। দিনের বেলায় যা একটু বেলায় ওঠা। অনেক রাত্রে, সারা দিন খেটে ফিরে কোনো কোনো দোকানের সামনের দাওয়ায় মশারি টাঙিয়ে যে মুর্শিদাবাদের মানুষেরা শুয়ে থাকে, তাদের অনেকেরই মশারি খুলে দেয়া, মশারির মধ্যে দেশলাই কাঠি জেবলে ফেলে দেয়ার দায়িত্ব আব্বাসের। আব্বাসউদ্দিন সর্দার। বয়েস প্রায় তেত্রিশ। লোকটি ঘুমভাঙা চোখে কেমন আতঙ্কে থাকে, এমনটি দেখে নিতে থাকে আব্বাস।

আম্মাদের জামাইয়ের দোকানে চা খেতে খেতে আজ সন্ধের ইবলিশি-পরিকল্পনাটাই পাকা হয়ে যায়। আব্বাস যা বলল, তা এরকম—সোহরাব আলি সর্দারের বাড়ি বাংলাদেশী ভাড়াটে রহমান—বাদামতলা মোড়ে ফল বিক্রি করে। ঘর ভাড়া দুশো পঁচিশ। টালির চাল, তিন ইঞ্চি দেয়াল। পাঁচ থেকে ছ ঘর ভাড়াটে। একজন উঠে গেলেই আবার নতুন কন্ট্রাক্ট, ভাড়া বাড়বে।

কেসটি ওভাবে সাজানো হয়ে থাকে। বাংলাদেশী ভাড়াটে রহমান মুর্শিদাবাদের মাছঅলা ইউসুফ শেখের বাক্স ভেঙে দেড় হাজার টাকার মতো সরিয়েছে। তাদের দুজনের ঘরের মাঝে তিন ইঞ্চি দেয়ালের খান চারেক ইট সরানো। সেখানে মাকড়সার জাল নেই, মুছে যাওয়া ঝুল। রহমান চার দিন কলকাতায় ছিল না। তার হাওড়ায় মাছের ব্যবসা। টাকা তখনই চুরি যায়। সেই টাকা ফেরত দিতে হবে ফলঅলাকে। না দিলেই মার, ঘর ছেড়ে দাও।

সন্ধের মুখে সোহরাব আলি সর্দারের বাড়ি বাংলাদেশী ফলঅলা রহমানকে সরু, টানা বারান্দার বাইরে থেকে আব্বাস ডাকে। সকালে তারা ঘরে সরেজমিনে এসেছিল। তখন রহমান ছিল না। জ্বর নিয়েই ফল নিয়ে বসেছিল।

তার ঘরে এসে আব্বাস ঢুকে যায়। ইট সরানো দেয়ালটি আবিষ্কার করে। সেখানে মাকড়সার জাল, ঝুল নেই। পাশের ঘরের মাছঅলা তখন ঘরের বাইরে। তার বিবি ছিল। সে ফলঅলার বৌয়ের নামে গাল পাড়ে।

আব্বাস, আনসার, ওমর। অন্ধকারে সকলেরই মুখ মুছে গেছে। সোহরাব আলি সর্দারের পেমেন্ট বাবদ পাঁচশো ছিল। পেটে সর্দার

পাড়ার চোলাই ছিল।

রহমান জ্বরে উঠতে পারছিল না। তার বিবি ওদের গলার গলা শুনে জানায় রহমানের বড় জ্বর। উঠতে পারছে না। ওরা ঘরে ঢুকে রহমানকে টান দিয়ে তোলে। তারপর তো মার শুরু হয়ে যায়! আব্বাস, আনসার, ওমর। আবার ঘুরে ফিরে আনসার, আব্বাস, ওমর। ওরা চাইছিল রহমান মারের মুখে বলুক, আমি টাকা নিয়েছি।

যুব কল্যাণ সমিতির ঘরে তখনও দাবা-ক্যারামের আলো। রহমানের বিবি ভয়মাখা চিৎকার তুলে সবাইকে সরিয়ে ক্লাবে আসতে পারে। মাইরা ফালাইল, খুন—এসব শব্দের সঙ্গে সে ক্লাবে পেঁাছে যেতে চায়।

ক্লাব থেকে কয়েকজন ছুটে আসে রাস্তায়। সবজির ঠেকে ততক্ষণে ডুমের আলোর নিচে পাল্লা ধরে—পাঁচ কিলো হিসেবে বাঁধা কপি, বেগুন, পালংশাক, গোছ বাঁধা শাদা মুলো।

হাতাহাতি হতে হতে ব্যাপারটা ছড়ায়। সবজির ঠেক থেকে বাদাম-তলা মোড় পর্যন্ত। মানুষ। মানুষ। 'গণধোলাই' শব্দটি ঘুরে ফিরে আসে। যে যার নিজের পুরাতন রাগ এই মুহূর্তে ঝালিয়ে নিতে চায়! মহরমের ঠিক আগে মাসুদের ভাতের হোটেলের খরিদ্দার সেন্টু শেখ আর তার লোকজনদের থাপ্পড় মারার জন্যে আনসারের ওপর মাসুদের পোষা রাগ ফেটে বেরোয়। আমার গ্যারেজের অনেক কাজ, বিশেষ করে সরাসরি গাড়ির ব্যাপারে আনসার থাবা বসাচ্ছে—সুতরাং মারো আনসারকে। পাড়া ছাড়া করে দাও।

আব্বাসের ওপর অনেকেরই পুরনো ক্রোধ। জুয়ার বোর্ড বসিয়ে তুমি এলাকা পয়জন করছ। সর্বনাশ করছ। পাল্টা আর এক দলের মনের ভেতর এরকমটি, তোমার জন্যে আমরা বোর্ড বসাতে পারি না। তাই গণরোষ। গণরোষ। গণধোলাই। তুমি এলাকা ছাড়া হলে আবার নতুন হিসেব-নিকেশ।—খুব দাদা হয়ে গেছে আব্বাস-ওমর-আনসার, না! ক্লাবকে মানে না। পাড়া-প্রতিবেশী মানে না। নাগরিক কমিটি, পার্টিকে মানে না—এটুকু অবশ্য আব্বাস-ওমরের বেলা হয়ত কিছু শিথিল হয়, কারণ নির্বাচনী-রাজনীতির গুঢ়-পাশা খেলায় তারা পার্টির কাছে কার্যত বাঁধা থাকে। উভয় উভয়কে খেলায়। কখনও গাড়ি নৌকোর ওপর। কখনও বা উল্টো, নৌকো গাড়িতে।

এই সে জটিল বাঘবন্দী, তাতে ক্লাবও চায় আমাদের কর্তৃত্ব মেনে না

নেওয়া আনসার, ওমর, আব্বাস পেটন খাক। সাধারণ মানুষের জমা ক্ষোভ 'গণরোষ'-এর বিশেষণ পেয়ে যায়। পার্টি ঠিক সেই মুহূর্তে ছবিতে আসে না। জনগণ—তার ওপর সংখ্যালঘু জনগণের কল বড় গোলমেলে! বক ধরার হেঁড়ো কল তবু বোঝা যায়, তবে ভোটবাক্স নামের সোনার খনিটি ভরাতে গেলে সকলকে চাই। আমরা কার হয়ে কার বিরুদ্ধে দাঁড়াব—এই প্রশ্নে নাগরিক কমিটি, পার্টি দ্বিধায় পড়ে।

পাবলিকের মার কখনও মাটিতে পড়ে না। দোকান থেকে, ঘর-বাড়ি থেকে রে-রে শব্দে ছুটে আসা নানা বয়েস—মার শালাদের। মেরে ফেল। শালারা বড় দাদা হয়েছে—বলতে বলতে এলাকা গরম করে তোলে।

আনসার তার বলশালী, সামান্য অ্যালকোহলিত শরীরটি নিয়ে জন-রাগ-এর বিষয়টি বুঝে উঠতে পারে না।—আমি তো পাড়ার ছেলে, ছোটবেলা থেকেই ব্রহ্মপুর, বটতলায়। কামালগাজি আমার কাছে দূর বিদেশ, একটা বাংলাদেশী লোককে পেটন দিচ্ছি বলে এত লোক! তাও আমাকে মারবে! আব্বাসকে মারবে! ওমরকে মারবে! ওদের এত হিম্মত! ভালো করে বাটাম দেব না, বাইনট! তাহলে সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। গুছিয়ে বাটাম।

এসব ভাবনার ফাঁকেই দু এক ঘা চড়-থাপ্পড় তার ওপর পরে। আর পাবলিক-রাগ দেখে এই প্রথম আনসার বুঝতে পারে, এখানে আর দাঁড়ানো ঠিক হবে না। ক্লাব, অয়েল মিল, সবজি-ঠেক, টেলারিং, টাইপ স্কুল, স্টেশনারি-মুদি দোকান, চা-দোকান, গোস্-ভাতের দোকান, সব তার বিরুদ্ধে। ক্ষোভ, বহু দিনের জমা ক্ষোভ পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে।

ঐ শালারা বাইরের মেয়েছেলে এনে ফুর্তি করে। সেই, সেবার আকলি নামের মেয়েটাকে এনে মারলে।

ঐ........রা জুয়ার বোর্ড বসায়

ঐ........রা সর্দার পাড়ার মদের ঠেক থেকে তোলা তোলে

সেটু শেখকে ওরাই মেরেছিল।

এই সব কলধ্বনি আনসারকে তাড়া করে। আনসার বুঝতে পারে পালানো ছাড়া রাস্তা নেই। সে পালায়। আব্বাস আর ওমর। গণ-ধোলাইয়ে পড়ে যায়। পিঠে, মুখে, বুকে—লাথি চড় ঘুষি। মাটিতে পড়ে গেলেও রেহাই নেই।

বল, আর দাদা হবি !

বল, আর জুয়ার বোর্ড বসাবি ?

বল, মুর্শিদাবাদের লোকদের মশারির ভেতর আগুন দিবি ?

সমবেত কিল চড় লাথি ঘুষিতে আব্বাস আর ওমর ক্রমশ ফুলে যেতে থাকে।

আনসার পালায়। রাস্তা পেরিয়ে, ক্লাবের পাশ দিয়ে অন্ধকার খোঁদল পেরিয়ে প্রথমে এরশাদদের ঘরে। এরশাদ দেখতে পায় আনসার ঠক ঠক করে কাঁপছে। সে আনসারের হাতটি ধরে। সেখানে বরফ লাগা মরা মাছের স্পর্শ।

আক্রাম অন্ধকার, বেলফুলের মাঠ, চিচিঙ্গা-লতার মাচা, পুকুর—সব পার করিয়ে তার দাদাকে নিয়ে কোনো নিরাপদ ছায়ায় চলে যেতে চায়। তাকে আগলে থাকে—দূর থেকে, এরশাদ।

এরশাদ আতঙ্কে থাকে, তার বাড়ি না আবার রেইড করে মানুষ। কিংবা গ্যারেজ অথবা আনসারের স্কুটারে যদি কেউ আগুন ধরিয়ে দেয় ! রাতে তার ভালো করে ঘুম আসে না।

আর রহিমা এ অন্ধকারে সবাইকে লুকিয়ে আনসারের জন্যে একবার কেঁদে নেয়, শব্দহীন ভাবে। আড়ালে চোখের জল মোছে। মনে মনে দোয়া চায়।

লোকাল নেতারা ঠিক খবর পেয়ে যান। কিন্তু রাতে তাঁরা কেউ আসতে চান না। বিষয়টি থানায় যায়। ওমর ও আব্বাস ডায়েরি করে আসে রাতেই। মেজোবাবু জিপ নিয়ে সে রাতেই এলাকায় আসেন।

সেদিন এ এলাকায় একটি বিয়ে ছিল। খুব জোরে অর্কেস্ট্রা বাজছিল মাইকে, বিয়ে উপলক্ষে আসা বাইরের পার্টি।

তিনি প্রথমে এসেই জানতে চান, এত রাতে মাইক বাজানোর পারমিশান আছে কিনা? তা নিয়ে কিছু ফজুল তর্ক হয়। মাইক থামে। তিনি কয়েকটি নামকে থানায় যেতে বলেন, পরদিন সকাল দশটায়। এরা যেন অবশ্যই গিয়ে বড়বাবু—ও. সি-র সঙ্গে দেখা করে।

লোকাল থানাটি যেন বা ফ্ল্যাট বাড়ি। তেমন বড় নয়। দোতলা। সামনে সাইকেল রাখার জায়গা। সিমেন্ট বাঁধানো বট গাছের তলায়

লাল সিঁদুর মাখানো বড় নুড়ি। ঢুকেই ডান দিকে লক আপ। তারপর ডিউটি অফিসারের টেবিল, পেছনে মালখানা। থানার চত্বরে একটা বুড়ো গাড়ির কঙ্কাল। জল-ঝড়ে ক্ষয়ে যাওয়া অ্যামবাসাডার। একটা সাবেক আয়রন চেস্ট, তলার পায়াটি মরচে পড়ে খসে গেছে, ফলে একদিকে কাত। তার ওপর একটি, দুটি চড়াই।

বটগাছের নিচে একটা বড় তক্তা পাতা। কিছু দূরে আরও একটি কাঠের গায়ে সেঁটে সেটি পাবলিকের বসার জায়গা হয়েছে। তার ওপর পাখিদের কোষ্ঠসাফের শাদাটে চিহ্ন।

এরশাদ পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে এসেছিল। এফ আই আর-এ অন্তত জনা পঁচিশ। এই পঁচিশটি নাম সবাই তার চেনা, তাদের সকলে আসে নি। এখন শীতের দশটা প্রায়। বড়বাবু এখনও নামেন নি। মেজোবাবু এসে পেঁছিন নি কোয়ার্টার্স থেকে।

লক আপের উল্টোদিকে, একটু এগিয়ে গেলে বাঁ হাতেই মেজবাবুর ঘর। স্বাস্থ্যবান এক অফিসার—বোধহয় সাহাবাবুই হবেন, একটা অটোর কেস সামলাচ্ছিলেন। শাদা, লম্বা, বড় কাগজে রিপোর্ট তৈরি করছিলেন। তলায় কপি রাখার কার্বন, ঐ মাপের কাগজ!

এরশাদ তাঁকে হাত জোড় করে নমস্কার করল।

পুলিশ অফিসারের ঘাড় তুলতে সময় লাগে। তারপর তাকিয়ে একটু তাচ্ছিল্যভরে—হ্যাঁ, বলেন।

আমাদের ব্রহ্মপুর বাদামতলার কেসটা—

ওটা তো মেজোবাবু দেখছেন, উনি ফোর্স নিয়ে কাল রাতে গেছিলেন। বসেন। এখনও তো আসেন নি। চলে আসবেন। এটুকু প্রায় একদমে বলেই তিনি আবার লেখায় ফিরে গেলেন। তারপর মুখ না তুলেই—আপনারা কিন্তু দেখা না করে যাবেন না—বলে আবার নিজের লেখায় ডোবেন।

মাথার পেছনে ঝুলমাখা ১৯৯১-এর ক্যালেন্ডার। আরও একটা ১৯৯০-এর। টেবিলে অনেক ফাইল, কাগজ। পাশে ফোন। সেখানে অফিসারের মুখোমুখি একজন কমবয়েসী উকিল। থানা থেকে যাদের জামিন করানো যায়, তেমন কেস-এর আশায়। এর মধ্যেই দুবার চা এলো। সাহাবাবু একবার খেলেন, একবার খেলেন না।

আর তখনই সেই জামিন করানোর আশায় বসে থাকা নবীন-

উকিলটি বলে উঠল, আছেন ভালো।

শুধু এই আছেন ভালোটুকুই ধরে নিলেন সাহাবাবু। তার থেকে তিনি চলে গেলেন—আমাদের সস্তা রেশন চাই না। আট ঘণ্টা ডিউটি আওয়ার্স, নির্দিষ্ট ছুটির দিন চালু কর। দরকার নেই আট আনা কিলো গম খেয়ে, ফ্যামিলি লাইফ হেল হয়ে গেল মশাই! যা-তা! অফিসে ঢুকলে আর বেরোবার সময়ের ঠিক নেই। কোনো দিন একটু তাতাতাড়ি যেতে গেলে ওপরঅলাকে তেল—স্যার স্যার করা। সব সময় তাকে খুশি রাখো। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই তোমার সার্ভিস লাইফে ঘুঘু চড়ল।

উত্তেজিত সাহাবাবু একটা সিগারেট চাইলেন সেই নবীন উকিলটির কাছে। সিগারেটের সঙ্গে দেশলাই। নিজের নিয়মেই বেলা বেড়ে যাচ্ছিল। এখনও মেজোবাবুর দেখা নেই। এরশাদ বুঝতে পারল তার অফিসটি আজ কামাই হলো।

এগার

বটতলার এই সংঘর্ষটি লোকাল থানা, পার্টি, নাগরিক কমিটি ও স্থানীয় বর্ষীয়ান মানুষজনের সহায়তায় বিচার সভা তৈরি করে ফেলতে পারে। শনিবার, মালতীবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়। সন্ধে সাতটা। বার্তাটি মুখে মুখে ছড়ায়।

সভার সাজগোজ এরকম ছিল। একটি টেবিল। কয়েকটি ভাড়া করা ডেকরেটরের ফোল্ডিং চেয়ার। বেঞ্চ। আম-জনতার জন্যে চট।

চুনকাম করা তিন ইঞ্চি দেয়াল। মাথায় টালি। দেয়ালে কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর করা রামের সাগর-বন্ধন করার দৃশ্যটি নিয়ে একটি ক্যালেন্ডার। এখানে লোকাল ভোটার লিস্ট-এর ফর্ম পূরণ হয়। রক্তদান শিবির, তাকে ঘিরে গম্ভীর বক্তৃতা হয়ে থাকে।

মাথার ওপর একশো পাওয়ারের ডুম। টেবিল ঘিরে রাখা ফোল্ডিং চেয়ারে নাগরিক কমিটির নেতারা, পার্টির নেতা। থানার বড়বাবু এলেন সাতটা কুড়ি। বাইরে জিপের ধমকানি থামল। শাদা প্যান্টের ভেতর—একটু ব্যাগি, সামনে দুটি করে মোট চারটি প্লিট—গুঁজে পরা

পেঁয়াজ রঙের হাফ হাতা কটকি হাওয়াই শার্ট, পায়ে জ্যাকসন শ্য়। কিন্তু মোজা নেই। হাতে কালো মলাটের ডায়েরি। চোখে সরু মেটাল ফ্রেম—তার ওপর কালো রং ধরানো চশমা। তাতে বেশ পাওয়ার। মাথার চুলে কলপ। সেই রং করা চুলে যত্ন করে টাকটি ঢাকা। সামান্য ভুঁড়ি। কোমরে বেল্ট আছে। গোঁফেও রং করার চিহ্ন।

মেজোবাবু এলেন আরও দশ মিনিট পর। টেরিকটের ফুল ইউনিফর্ম। পায়ে বুট। কোমরে রিভলভার। হাতে লাল মলাটের বড় এগজিকিউটিভ ডায়েরির ভেতরে একগাদা কাগজ-পত্র। মেজোবাবু—সেকেন্ড অফিসার, বেশ মোটার দিকে। তাঁরও মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চওড়া কপাল। তবে গায়ের চামড়া বড়বাবুর মতো ফর্সা নয়।

বড়বাবু, মেজোবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, ওঁদের অনুমতি নিয়ে সভার কাজ শুরু হলো।

প্রথম বলতে বলা হলো বাংলাদেশী ফলঅলাটিকে। তখনও তার গায়ে জ্বর। একটা বিছানার চাদর জড়ানো। কাশছে। মুর্শিদাবাদের মাছঅলা আসেনি।

আমারে আব্বাস মারে, ওমর মারে। আমি ট্যাহা চুরি করি নাই—একথাগুলোই সে টেনে টেনে দীর্ঘ করে বলতে চাইছিল। তার বিবি মাঝপথে কী একটা বলার জন্যে উসখুস করে দাঁড়াতে চাইলে একজন নেতা—নতুন কিছু বলার না থাকলে বসে যান, বলে তাকে থামিয়ে দেয়।

আব্বাস বলে, তারা সরেজমিনে দেখেছে ঘরের দেয়ালের ইট আলগা করা হয়েছে। সেখান থেকে ঝুল-মাকড়সার জাল—সব সরে গেছিল। আর বাংলাদেশী লোকটি—ঐ ফলঅলা—যেদিন সে তার ঘরে গিয়ে ইট সরানো দেখতে পায়—তাকে ঘরে এসে দুটো ভাত খেয়ে যেতে বলেছিল।

আব্বাস বলে, আমি খাইওনি, যাইওনি। বলি, এখন আমি গা-ধুয়ে আসছি। বাড়িতে ভাত খাব।

সময় কেটে যাচ্ছিল। চটে বসা গ্রামবাসীরা অনেকেই অনেক, অনেক আগেকার বিচার তাঁদের স্মৃতি থেকে আনছিলেন। যেমন অনন্ত-

বাবুদের বিচার, পরীযান বিবি, বাবর আলি পুরকাইত, স্নেহময়বাবুরা—সেই সঙ্গে হালফিলের এইসব 'বে-আক্কেলে বিচার'। কথায় কথা বাড়ছিল। বিড়ি পুড়ছিল। তার ধোঁয়া ঘুরছিল ঘরের বাতাসে। জানলা দিয়েও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল অনেকে।

সাইলেন্স প্লিজ, আপনারা চুপ করুন। বলার থাকলে দাঁড়িয়ে বলুন—এসব কিছুই তেমন করে কারও কানে যাচ্ছিল না। কেউ কেউ কেমন কপি, মুলো হলো এবারে—জমির দালালি করে কী রকম কে দু পয়সা করল, তা নিয়ে কথা বলছিল। কেউবা এই যে এক পশলা পানি হয়ে গেল তারপর মেথি, ধনে, বীট লাগাবে কিনা আলোচনা করে জেনে নিতে চাইছিল। পাল্টা মন্তব্য ছিল, বীট, ধনে কি পয়সা দেবে?

নেতারা মাঝে মাঝেই বক্তাদের থামিয়ে দিয়ে বলছিলেন, সংক্ষেপ করুন। সময় বড় কম। নতুন কথা না থাকলে বলবেন না। কিছু বলার থাকলে হাত তুলবেন। আমরা ডেকে নেব। তখন দাঁড়িয়ে বলবেন।

কেউ কেউ বলবে বলে হাত তুলেও নামিয়ে নিচ্ছিল। দাঁড়িয়ে বলতে ভয় লাগে। তিন চার জন বয়স্ক মানুষকে ক্লাবের পক্ষ থেকে শিখিয়ে আনা হয়েছিল আনসার, ওমর, আব্বাসকে কারা বা কে কে মেরেছে জিগ্যেস করলে সবাই যেন এক সঙ্গে বলে ওঠে—আমরা সবাই মেরেছি। ক্লাব, তার পরিচালকমন্ডলী, তারাও তো নিজেদের আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি সামনে রেখে আত্মরক্ষার বেড়া খাড়া করতে চেয়েছিল।

এরকম প্রশ্ন না ওঠাতেও পেছন থেকে দু-একবার শোনা গেল—আমরা সবাই মেরেছি। তখনই নেতাদের আরও জোরে ধমকাতে হলো।—কী পেয়েছেন কী সব! আপনাদের কী জিগ্যেস করা হয়েছে! যত্ত সব।

বড়বাবু যখন বলতে উঠলেন তখনই মেজোবাবুর পায়ে বার বার মশা বসছিল। তিনি বুট বাঁধা পা নাড়াচ্ছিলেন। ঢ্যাঁটা মশা তবুও উড়ে এসে আবারও বসছিল।

বড়বাবু বললেন, এই এলাকায় কয়েক দিন আগেও তো কোনো অশান্তি ছিল না। কেন এমন হলো! আইন আপনারা কখনও নিজের হাতে নেবেন না। থানাকে জানান। পুলিশকে ইনফর্ম করুন। আমরা তো আছিই। আমার কাছে খবর আছে এ অঞ্চলে চোলাই,

সাট্টা আছে। জুয়া আছে। ভেঙে দিন, ভাঙার আগে একবার আমাদের জানান। এরপর যদি আপনারা এভাবে নিজের হাতে আইন তুলে নেন, তাহলে আমরাও আমাদের মতো অ্যাটাকিং মেজাজে আসব। আসব। তুলব আর পিটব। কেস দেব। একটা কেস মিটবে, আবার দেব। এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসা তখন শক্ত হবে। জানেন তো, পুলিশ যদি একবার মনে করে

বড়বাবু কথা থামিয়ে বসে পড়ার আগেই অনেক হাততালি পড়ল।

মেজোবাবু ইউ. পি-র ঠাকুর। তাঁর বাংলাটি বড় প্রশংসার। সভাপতি, প্রধান অতিথি-বড়বাবু, লোকাল নেতা, সমবেত শ্রোতা—কাউকেই তিনি নমস্কার জানাতে ভুললেন না। এলাকার শান্তি বজায় রাখার জন্যে তিনি বার বার জোর দিলেন। আর বললেন, সেক্রেটারি—এখানে যুব কল্যাণ সংঘের সেক্রেটারির কথাই বলা হলো, ইচ্ছে করলে সে দিন গোলমাল রুখতে পারত। আসলে বক্তার মনে ছিল যুব কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি তাঁর রাজনৈতিক ছাতার নিচে নয়। হাততালি তিনিও পেলেন।

নাগরিক কমিটির নেতার বক্তৃতার আগেই একটু একটু করে ভিড় কমছিল। তিনি তো বাংলাদেশীরা কেন আসছে—ভাড়া দেয়ার আগে নাম ঠিকানা, লোকটি আগে কোথায় ছিল, তা কেন কোয়ারি করা হয় না—সে সব নিয়ে অনেকক্ষণ বললেন। সবশেষে বাংলাদেশী ফলঅলা, ওমর আর আব্বাসের- ডাক্তার ওষুধ খরচা বাবদ কিছু টাকা ফাইন ধরা হলো—যাদের নাম এফ আই আর-এ ছিল, তাদের কয়েকজনের কাছ থেকে। এই জরিমানার টাকা যারা তুলবে, তাদেরও নাম তুলে দেয়া হলো খাতায়।

বক্তৃতা শেষ হওয়ার আগেই চা এসেছিল। আর স্টিলের জগে জল। নেতারা, থানা অফিসাররা চা পাবেন। বড়বাবু চা নিলেন না। তাঁর সুগার আছে। চিনি বারণ। আনন্দে করে চা খাচ্ছিলেন মেজবাবু। পায়ে বসা মশা তাড়াচ্ছিলেন পা নেড়ে নেড়ে। বার বার হাতঘড়িতে সময় দেখছিলেন বড়বাবু। তাঁর দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মাথা নিচু করে বেঞ্চে বসেছিল আনসার। পলিথিন বডি টাইটান কোয়ার্জে সময় খসে যাচ্ছিল। তার তো কিছু বলার নেই। সে মাঝে

মাঝেই আশপাশের লোকজনের মুখের দিকে চাইছিল। আব্বাসের মুখ এখনও একটু একটু ফোলা। বুক আর পেটের ফটো করাতে হয়েছে!

কী দরকার ছিল এর! আমায় তো ব্রহ্মপুরে থাকতে হবে। ব্যবসা করে খেতে হবে। দাদাগিরি করলে চলবে? বাইরে পুলিশ-জিপ ছাড়ার আওয়াজ। স্কুটার চালু করার শব্দ। লোকেরা একে একে চলে যাচ্ছে। একটু পরেই মালতীবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়-এর সবচেয়ে বড় ঘরের একশো পাওয়ারের ডুমটি নিভে যাবে। তারপর মশাদের ওড়াউড়ি।

ক্লাবের ছেলেরা, সবজি-ঠেক, অয়েল মিল, আটা চাকি, গুল কোম্পানি, কেরোসিনের দোকান, স্টেশনারি-মুদি দোকান, টাইপ স্কুল, চুল কাটানোর দোকান, চা-দোকান, টেলারিং শপ, অন্য গ্রামবাসীরা—সবাই চলে যাচ্ছে। নাগরিক কমিটির নেতারা বড়বাবু-মেজবাবুর সামনে ফাইনাল হাসি হাসছিল। আর আনসার, ওমর, আব্বাস—পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। কাছাকাছি। কেউ কোনো কথা বলছিল না। অনেকক্ষণ পর আনসারের খৈনি খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল। তার প্যান্টের টিকিট পকেটে খৈনির ডিবে।

আনসারের স্কুটার-শব্দ রহিমাকে বাইরে আনল। বাইরে মানে রান্নাঘরের বাইরে—সেতো রেহনাবিবির সঙ্গে গোস্ত কুটছিল। রেহনাবিব বলছিল ফুলকপি দিয়ে গোস্ত হবে।

মাথা নিচু করে আনসার ঢুকছিল।

কি রে মেটালি বাবা! এরশাদ জিজ্ঞাসায় থাকে।

আনসার জানে এরশাদ মালতীবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিচারে ছিল। তবু এ উদ্বেগটুকু তার ভালো লাগল। বড় চিরুনি দিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে চুল পাট করতে করতে আনসার বলল, কেন, তুমি জান না!

রহিমা ততক্ষণে দু কাপ চা নিয়ে দরজায় ভেসে উঠেছে।

বার

সকাল দশটা নাগাদ ব্রহ্মপুর জামে মসজিদের উল্টোদিকে একজন মানুষকে ঘিরে গোল ভিড়। রং ওঠা হলুদ লুঙ্গি, পায়ে পলিথিনের পা-ঢাকা জুতো তাতে চামড়ার তাপ্পি। হাত গুটিয়ে ফুল-শার্ট পরা, সেই লোকটি চেঁচিয়ে কথা বলছিল। পাঁচ ফুটের ওপর লম্বা। সামান্য ভুঁড়ি আছে। ঘাড় অব্দি চুল। গালে পান। ফুল শার্টের কলারে মথার তেলের গাঢ় কালো দাগ।

আমার নাম লালচাঁদ সর্দার। এগারোশো সাপুড়ের সর্দার আমি। বলতে বলতে মাইক ছাড়াই গলাকে একটা বিন্দুতে তুলে দিয়ে দিব্যি নামিয়ে আনতে পারে মানুষটি। পালিশ ছাড়া সুইচ বোর্ড চেহারার চৌকো চৌকো বাক্স। তার মধ্যে সাপ আছে। এরকম অনেকগুলি বাক্স শাদা কাপড়ের বোঁচকা করে এক সঙ্গে বাঁধা। এই বোঁচকাটি অপর একটি কমবয়েসীর কাঁধে।

লালচাঁদ সর্দার সিফিলিস, গনোরিয়া, ধ্বজভঙ্গ, মেয়েদের শ্বেতস্রাব —সব ভালো করার গ্যারান্টি দিচ্ছিল তার দশ টাকার মাদুলিতে। আসল শিকড় বা তিন ধাতুর মাদুলির কোনো দাম নেই—লালচাঁদ বলতে চাইছিল, সারা বছর তার সাপেদের 'দুধ-কলা' খাওয়াতে হয়, এটা তার খরচ।

প্রথমে কতগুলি যৌন-আসনের ছবি দেখানো, তারপর সঙ্গমে অতৃপ্তি ও স্বপ্নদোষের বিস্তারিত বিবরণ। বয়স্ক মানুষকেও নবীন বানানোর গ্যারান্টি এই মাদুলিতে। লোম-পটলের গাছ খেয়ে নাকি পুরুষ বীর-হনুমান পর পর স্ত্রী হনুমানে উপগত হয়ে যায়,—তার ভাষায় কুৎসিত করে—সেই লোম-পটল নাকি এ মাদুলিতে।

যাদের মাদুলি চাই, তারা হাত তোলো। লালচাঁদ বলছিল।

ভিড়ের অনেকেই হাত তুলে মাদুলি নিচ্ছিল। এবার যারা মাদুলি নিয়েছে, তাদের দশটাকা করে জমা দিতে হবে। মাদুলি যদি হিন্দু ভাই নেন, তাহলে তুলসীতলার মাটি দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে হবে, এমনিতে তো মোম দেয়াই আছে, তবুও। যদি মুসলমান ভাই নেন,

তাহলে মসজিদের মাটি দিয়ে বন্ধ করতে হবে।

মেয়েরা পরলে লাল কারে বাঁ হাতে। ছেলেরা পরলে কালো কারে ডান হাতে।

ও বাবা, জলে দাঁড়ায়ে কখনও পেচ্ছাব করবি না। জল হিন্দুর মা গঙ্গা বাবা। মুসলমানেরও বড় পবিত্র জিনিস। তাতে অভিশাপ লাগে। পুরুষ-অঙ্গের ভেতর দিয়ে জলের আয়রন যায়। কিডনি ড্যামেজ করে। স্টোন হয়। তখন পেচ্ছাব করতে গা মোচড় দেয়। কষ্ট হয়। সারা শরীর থর থর করে কাঁপে।

লালচাঁদ উঁচু-নিচু গলায় এসব বলে যাচ্ছিল—দেখ বাবা, পরের খাতায় কখনও লিখো না। পরের নাওয়ে বাইচ খেলো না। তাহলে একদিন দেখবে কলম আছে, কালি নেই।

শ্রোতারা সবাই লালচাঁদের কথা হাঁ করে শুনছিল। মজা পাচ্ছিল। বাচ্চারা ভিড় করেছিল সাপ খেলা দেখার জন্যে। দু-একজন মা-ও, ঘোমটা মাথায়। বাচ্চা কাঁখে। এদের দেখেই বুঝি লালচাঁদ বলল, যে সব বাচ্চার প্রস্রাব হয়ে যায়, বারো বছর বয়েস, কিন্তু বিছানায় করে ফেলে, তাদের এই মাদুলি দাও। অব্যর্থ ফল।

কথার মোড় ঘুরে যেতে বয়স্কদের ভালো লাগছিল না। তারা বুঝি বা আরও, আরও অনেক বেশি শারীরিক ভাবে ভোগ করার ক্ষমতা চাইছিল। তারা কলম আছে কালি নেই, পরের খাতায় লেখা, পরের নৌকোয় বাইচ করা—সবই বুঝতে পারছিল।

লালচাঁদ মাদুলি দেয়ার আগে কী একটা যেন শিকড় তিল পরিমাণ কেটে সকলকে—যারা মাদুলি নেবে দশ টাকা দিয়ে, খেয়ে নিতে বলছিল। লালচাঁদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী যারা বিবাহিত তারা এই শিকড় খাওয়ার পর আধখানা পান চিবিয়ে খাবে। তারপর এক গ্লাস জল খাবে। অবিবাহিতদের পান খাওয়ার দরকার নেই।

এক ঝাঁকা মুলো মাটিতে রেখে কে একজন দাঁড়িয়ে মাদুলির ভিড়ে। তার মুলো শাক খুঁটে, ছিঁড়ে খাচ্ছিল রাস্তায় চরা মুরগি।

লালচাঁদ হাঁকছিল মাদুলি পরে সবখানে যাবি বাবা। শ্মশান, গোরস্থান, ভাগাড়। মুর্দা, লাশ ধরবি বাবা। তবে ঐ যে বললাম, খারাপ মেয়েদের পাড়ায় যাবি না বাবা। তাহলে মাদুলি হারিয়ে যাবে। আর যদি একান্তই যেতে হয় বাবা, কারোর যদি নেশা থাকে,

তবে এটি খুলে সেখানে যেতে পারেন।

এসব কথার ফাঁকে লালচাঁদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কাঠের পালিশ না করা চৌকো বাক্স খুলে ফেলেছে।

এই যে দ্যাখেন দাদা কালনাগিনী। বেহুলা-লখিন্দরের লোহার বাসর-ঘরে ঢুকেছিল। খেয়েছিল লখিন্দরকে। একটা টাকা দ্যান দাদা এর বাক্সে। আমি সাপটা আপনার গায়ে বুলিয়ে আশীর্বাদ করব। ভালো হবে আপনার। এক টাকা দাদা, ওতো আজকাল চা খেতে লাগে, হাতের ময়লা।

কেউ কেউ এসব কথায় টাকা দিয়ে দিচ্ছিল।

কালনাগিনীর পর লাউডগা।

এর বিষ নেই দাদা। তবে চোখ খুবলে নিতে পারে। দ্যাখেন, কেমন আমার কথা শোনে—হাঁ কর। হাঁ কর তুই। হাঁ কর।

লালচাঁদের হাত ঘোরানোর কায়দায় লাউডগা হাঁ-মুখটি দেখায়। তারপর আসে বালি-বোড়া, শাঁখামুটি, চন্দ্রবোড়া—সবই দাঁতভাঙা, বিষহীন। আর এই শীতে যেন বা প্রাকৃতিক নিয়মেই কিছু নির্জীব।

লাউডগা এবার লালচাঁদের কথা ছাড়াই হাঁ করে। সাপ, সে যে তার মালিককেও চেনে না, এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সাক্ষী দিতে। মাদুলি কেনা দর্শক অবশ্য সে দিক নজর দিয়ে উঠতে পারে না।

সত্যি সত্যি কালনাগিনী গায়ের ওপর এনে টাকা নিচ্ছিল লালচাঁদ। ভয়ে, কিছুটা সংস্কারে এমন রোজগার! ঘড়ির কাঁটা তখন অনেকটাই এগিয়ে গেছে। নয় নয় করেও সত্তর টাকার মাদুলি বিক্রি হলো। আর সেই ভিড়ের ভেতরে এদিক ওদিক তাকিয়ে শাগির একটা মাদুলি নিয়েছিল।

আমি লালচাঁদ সর্দার। আমার ছবি হয়ত আপনারা টেলিভিসনে দেখে থাকবেন। বলে সে নিজের একটি রঙিন পোস্টকার্ড সাইজের ছবি সবার সামনে তুলে ধরল। কেউ দেখল না। মাদুলির ভিড় ততক্ষণে ভেঙে গেছে।—আমার আণ্ডারে—এই ইংরেজি শব্দটি সে খুব সহজেই পারে—এগারো শো সাপুড়িয়া—

বাদামতলায় এখন আর ভিড় নেই। চা-দোকানে লালচাঁদ চা খাচ্ছিল। এক ভরি বিষ এখন চার হাজার টাকা। এগারোশো সাপুড়িয়া তাদের ধরা সাপ আমায় দিয়ে যায়। আমি সেইসব সাপ

নিয়ে কলকাতার মেডিকেল কলেজে—লালচাঁদ চায়ের দোকানের খরিদ্দারকেও দখল করে নিচ্ছিল।

ঠিক তখনই মিষ্টু অটোমোবাইলস-এ গাড়ির নিচে, অন্ধকারে পেট অব্দি ঢুকিয়ে টান টান শুয়েছিল আনসার। তার পিঠের নিচে পাতলা পলিথিনের সিট। আজও ভোরে, ঘুম থেকে ওঠার পর রহিমার সঙ্গে আমার দেখা। রহিমা বলছিল, এখান থেকে দুজনে কোথাও চলে যেতে। কিন্তু চলে গেলে মিষ্টু আটোমাবাইলস! কে সামলাবে! আবার নতুন করে কি শুরু করতে পারব জীবন! নিজেকেই নিজে এভাবে খুঁড়ে ফেলছিল আনসার। লোকেই বা বলবে কি—নিজের মাসতুতো ভাইয়ের বৌ-কে নিয়ে—তারপর ব্যাঙ্ক লোন—

একটু দূরে দাঁড়ানো আব্বাস। বার বার ভাড়া দিচ্ছিল, তুমি কি গড়িয়া যাবে!

অনুমানের হঠাৎ জ্বর এসেছিল। শীতে যেমন হয়ে থাকে: আজ জ্বর সেরেছে। এ বাড়িতে মসজিদের ওস্তাদজি—মৌলানা-সাহেব খাবেন। সকালেই তাকে দাওয়াত দিয়ে আসা হয়েছে। ভোরের চা দিয়ে শুরু। মৌলানাসাহেব সকালের প্রথম চা-টি খান দোকানে। তবু তিনি কথা দিয়েছেন, যাবেন। আনসারই দাওয়াত দিতে গেছিল।

দোয়া-দরুদ পড়ে দুটি মুরগি কাটা হয়েছে। গতকাল সকাল থেকে ওদের পায়ে দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছিল, হালালের জন্যে। যাতে না নোংরা খায়। এবার তার পশম ছাড়িয়ে খালপোষ করা হবে। এসব কাজ রোকেয়াবিবি এখনও পারেন। রেশন কার্ডে যদিও তিনি 'বেওয়া'।

মৌলানা-সাহেব টুপি পরা মাথাটি নেড়ে সর্বকালোপযোগী তৌহিদবাদ—আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী দর্শনের কথা বলছিলেন। এরশাদকে মন দিয়ে শুনতে হচ্ছিল—সবে তার বড় কন্যার জ্বর-মুক্তি হয়েছে। কথার গতি দেখে মনে হচ্ছিল আজও অফিসটা যাবে।

বাবা, এক আল্লাহ্‌, এক রসুল, এক কুরআন—এটাই ইসলামের মূলকথা। আল্লাহ্‌র একত্ব (তৌহিদ), রসুলের বিশেষত্ব, কুরআনের লালিত্য মিলিয়েই ইসলাম। এসব কথা ওস্তাদজি খুব সুন্দর করে বলতে পারছিলেন। তাঁর শাদা টুপি ঢাকা মাথাটি শাদা-কালো খোপ-তোলা উড়ান দিয়ে থুতনির সঙ্গে বাঁধা।

বাইরে রোদ পড়ে আসছিল। কাজের চাপে আনসারের জিভ বেরিয়ে

যাওয়ার দশা। মাঝে মাঝেই বাবুয়া, দিলীপ, আক্রাম, ফরিদকে বকাবকি করছিল। পর পর ছাড়তে হবে পার্টিদের কাজ। রং-মিস্তিরি, বডি-মিস্তিরি, গ্যাস কাটারের নীলচে আলো, সব মিলিয়ে এক নৈনেত্তর জগৎ।

গাড়ির নিচে থেকে শরীর বের না করেই আনসার আব্বাসকে বলল, না গো, এখন গড়িয়া যাবো না। এটুকু বলতেও তার বেশ সংকোচ হলো—হয়ত কোনো দরকার ছিল আব্বাসের। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। দিল্লি থেকে 'মওলানা'টাও পাশ দিয়ে আসতে পারল না। মাঝ-পথে ছেড়ে চলে এলো। ফলে হলো ডুবাডুব—এলোমেলো ঘোরা। টাকা রোজগারের জন্যে 'দাদাগিরি', জমি, মাটির দালালি। এসব করতে করতে পার্টির পায়ের নিচে।

জগের পানিতে 'ওজু' করে 'বিসমিল্লা' বলে খাওয়া শুরু করেছিলেন ওস্তাদজি। এখন তিনি শেষ পাত—স্টিলের থালাটি চেটেপুটে, হাত চেটে পরিষ্কার করে খাচ্ছেন। ইসলামে এইটাই ধারা।

এরশাদের আজ অফিস যাওয়া হয়নি। সে ঘুরে ঘুরে ওস্তাদজির যত্ন করছিল। শীতের রোদ পড়েছিল ওস্তাদজির কড়া ওঠা পায়ের পাতার ওপরে।

অনেকটা দূরে, রান্নাঘরের দরজায়, আড়ালে রেহনাবিবির পাশা-পাশি রহিমা দাঁড়িয়ে। একটু আগেই আকিল এসেছে। তার এখনও সিজন। আরও দিন সাতেক পর তাকে কামালগাজি নিয়ে যাবে বলেছে আকিল। একজন আনপড়, মুসলমান মেয়ে—যাকে স্বামী ঠিক মতো নেয় না, সে যতটা জেদ ধরতে পারে কামালগাজি যাওয়ার জন্যে, রহিমা ততটুকুই জেদ করছিল। আকিল রাজি হলো না। সিজন মিটলে সব টাকা এক করেই সে ঘর তুলে তবেই রহিমাকে কামালগাজি নেবে।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে এসবই ভাবছিল রহিমা। আকিল এখনও চলে যায়নি। তার কোনো মাসির বাড়ি আছে। ওস্তাদজি চিলমচিতে হাত-মুখ ধুয়ে পানি ফেলছিলেন। তাঁর ছাঁটা দাড়িতে জলের দু একটি টুকরো আটকে যাচ্ছিল।

গাড়ির তলা থেকে কালিমাখা শরীরটি বের করে এনে আনসার খৈনি বানাল। সাগরদ্বীপে একটা সরকারি গাড়ি পৌঁছতে হবে। কল্যাণ বক্সি একটা গাড়ি নিয়ে আসবে। স্কুল বোর্ডের গাড়ি আছে। কোটেশান, বিল, পেমেন্ট—এইসব করতে গিয়ে তো পাগল হওয়ার উপক্রম। কোন

কাজটা আগে ধরবে—কিছুই বুঝতে পারছিল না আনসার। সবই আটকে আছে গলার কাছে। পার্টি কথা না রাখতে পারলেই খিস্তি দেয়।

কি এমন খামতি ছিল আমার পড়াশোনা হলো না! থাকি ঘুরে ঘুরে—খাই মামার বাড়ি, দুবেলা। জলখাবার নিজের পয়সায়। এভাবে কি জীবন চলে! বাবা কেন আমাদের যত্ন নিয়ে পড়াশোনা শেখাল না। কেউ তো বলে দেয়নি বরদাপ্রসাদ থেকে ক্লাস পালিয়ে—নিজেকে এভাবেই অবিরাম খুঁড়ে ফেলতে ফেলতে আনসার আবারও এমন জিজ্ঞাসায় যায়—মাঝে মাঝেই শুনি দেশটা হিন্দুদের হয়ে যাবে। মুসলমানদের ঝেঁটিয়ে তাড়াবে। মুসলমানরা এখানে জবাইয়ের মুরগি। কী হবে ঘর-বাড়ি করে! জমি বাড়িয়ে। মুসলমানের ছেলে তো চাকরি পায়না। আসলে আমাদের এডুকেশান নেই। মাথা তুলে তাই দাঁড়াতে পারি না।

আর তখনই কোথা থেকে যেন সঙ্গীদার মা ভেসে ওঠে। এই নারীই তাকে প্রথম বাস্তুচ্যুতির খবরটি দিয়েছিল। আনসার আবারও একটি খারাপ খবরের প্রতীক্ষা করে। সঙ্গীদার মা তার ছানি লাগা চোখে—কই গেলি বাবা আনসার! কই গেলি বাপ—বলে কেঁদে ওঠে।

ধ্যাস, সোগো—কী হলো বলবে তো—খৈনির থুথু মাটিতে বিসর্জন দিতে দিতে আনসার বলে ওঠে।

—ও বাবা, আমার সাম্মাদটা ঘরে ফিরছে না তিন দিন হলো—সেই যে পরশু ভাত খেয়ে বেরিয়েছে—

আনসারের এমনিই মটকা—মাথা গরম। তারপর এই বুড়ির কান্না।
—দ্যাখো, পাগল-ছাগল কোথায় গেছে!

সাম্মাদের সত্যি সত্যি মাথার গণ্ডগোল আছে। মাঝে মাঝেই সে ঘরবাড়ি ছেড়ে এদিক-ওদিক চলে যায়। এর আগেও এমন বার দুই তিন—

ও কি হবে, ফিরে আসবে! আনসার সহজ হতে চাইল।

কাগজে, টি বি-তে ছবি দিয়ে একবার দে দে বাপ, রেডিউতে…

তার জন্যি টাকা লাগবে। ছবি লাগবে। অনেক ঝামেলা।

যা টাকা লাগে দেব—বলতে বলতে বুড়ি আরও একবার কেঁদে ফেলল।

সরো। সরোতো। নইলে চাপড় খাবে! কাজের সময় যত ছেঁড়া

ঝামেলা। বুড়ো হলি এই জন্যি মানুষদের চিড়িয়াখানা পাটিয়ে দেয়া দরকার। কেটে বাঘকে খাইয়ে দেবে। বলতে বলতে নিজের দূর সম্পর্কের নানিকে ধমকে উঠল আনসার।

ও বাবা দ্যাখ না।

আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেলো তো! তার আমি কি কর্‌ব! আর কাগজে যে দেবে, তোমার ছেলে কি পড়তি পারে?

দারোগা-বুড়ি ঘাড় নাড়ল —পারে না!

তাহলে কি পিঁয়াজ ছিলতে কাগজ দেবে? যাও, যাও সরো। পকেটের পয়সা ফুরোলে ও আপনি ফিরে আসবে। ডাকাতি হবে না।

বাবা, বৌটা ঝগড়া করে করে সাম্মাদরে—ও সাম্মাদরে, বাপ আমার। বুড়ি চিক্কুর পাড়ল।

ভালো ঝামেলা হলো তো। বলছি এখন কাজের সময়। আমি কি থানার দারোগা! যাও, থানায় গিয়ে জানাও, দ্যাখো যদি তারা কিছু করতি পারে।

দারোগা-বুড়ির সঙ্গে কথোপকথনে আনসার আগাগোড়াই ডাইলেকটে থাকে।

দারোগা-বুড়ি তবু নড়ছিল না।

রাগে, বিরক্তিতে আনসার নিমের ছায়ার নিচে সরে গেল।

তের

দুপুরে, বেশ শীত পড়ে গেলে, ব্রহ্মপুর জামে মসজিদ থেকে মাইকে শোনা যায়, কাল থেকে আশর-এর নামাজ সাড়ে তিনটেয়, জমাত পৌনে চারটেয়। রহিমা শীতের নিস্তরঙ্গ দুপুরে মাইকের এমন উচ্চারণ শুনছিল কি শুনছিল না। তার শরীর ক্লান্ত ছিল, হয়ত কাল রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে জেগে ওঠায়—বাড়ির সামনে বাতাবি লেবুর ছায়া, কাঁঠাল গাছের জ্যোৎস্নামাখা শরীর, ছাগল-গোরু রাখার আলাদা আলাদা ঘর, মুরগি রাখার কাদালেপা খোঁয়াড়—সবই এই চাঁদের আলোয় আশ্চর্য ছিল।

উঠোনে এক মানুষ সমান—কি তারও বেশি উঁচু, ডাঁই করা খড়,

হিমে ভিজছিল। ঝাড়া ধান কাঠের পাটায় পিটিয়ে পিটিয়ে সারা দুপুর তুলে রাখা হচ্ছিল বস্তায়। তারপর কোনো পাকা ঘরে, হাস্কিং মেশিনে পাঠানর প্রতীক্ষায়। এখনও উঠোনে একটি দুটি ধান, পায়ের নিচে।

রহিমা হয়ত স্বপ্নে ছিল। তার স্মৃতিটুকু লেগে ছিল তার মুছে আসা অশ্রুরেখায়। এই জলের দাগে, কান্নায়, হয়ত আকিল ছিল। আনসারেও।

অঘ্রাণের কুয়াশা নেমেছে পৃথিবীতে। জ্যোৎস্নায় তার গায়ে মহার্ঘ মসলিনের মায়া। পুকুরের জল স্থির, চন্দ্রাহত। গায়ে চাদর টেনে রহিমা পুকুর ঘাটলায় দাঁড়িয়েছিল। শুকনো চিচিঙে লতার মাথায় তেমনই চাঁদের আলো। চষা মাঠে বেলফুল গাছের নবীন ডগায় পাতা। তার গায়ে চাঁদ পাওয়া অন্ধকার।

স্মৃতি ফেরানোর খেলায় রহিমার মনে পড়ল এই পুকুর পারে কতদিন হাঁসডাকা—ছোট হাঁসদের চৈ-চৈ, আ-চৈ-চৈ। বড়দের—বয়স্কদের, ও হাঁস, আয়, আয়, গোড় গোড়। শীতে ভোরে হিম ভেজা খড়ের ওপর ঘুম ভাঙা কুয়াশা-মলিন হাঁসেরা। সে তো কত বছর হয়ে গেল। নির্দোষ বালিকা-বেলায়। রহিমা শ্বাস চাপল।

জল ভাঙতে ভাঙতে জমিকে খেয়েছে। তাই তাল গাছ, মাজায় তিনটে ঢেউ দেয়া খেজুর গাছ—সবই পুকুরে। সেই ছায়াতলায়—যেখানে ডুমুর, খেজুর, ফলসার ছড়াছড়ি, সেখানে গরমে হাঁসেরা ছায়ায় জিরিয়ে নেয়। ভাত কিংবা আরও কোনো খাবারের আশায় ঘাটের ধারে ঘুরে ঘুরে আসে। ফিরে যায়। আসে। তাদের খসে পড়া পালক ঘাসের বুকে ওড়ে। পায়ের দাগ পড়ে থাকে চলার পথে। ডাকাডাকিতে বেলা বাড়ে। এক সময় দাগ মুছেও যায়।

এই চাঁদ লাগা পুকুর পাড়ে রহিমা এই শীতে হয়ত তার ভেসে ওঠা শরীর দেখতে পাচ্ছিল। জল ছুঁয়ে আছে নারকেল পাতা, বাঁশ পাতা, কিন্তু খুদখুশি—আত্মহত্যা—ইসলাম ধর্মে না-জায়েজ, এমন বোধ তখন তার মাথাতেও আসেনি। সে তো দেখতে পাচ্ছিল ঢেউ লাগা চাঁদের আলোয় চিত হওয়া শরীরে—রহিমার জানা ছিল নারী-শব চিত হয়ে ভাসে, পুরুষ মরার পর উপুড় হয়ে—আর রহিমা, সে তো ভাবনায় চুল খোলা, ভিজে জড়িয়ে গেছে যেন জলেরই সঙ্গে। বুঝিবা কচুরিপানার শেকড়বাকড়। গালের একপাশে আকাশ-আলো। সে একটু একটু করে

ভেসে যাচ্ছিল। পেটে ফলিডলের মরণ-যন্ত্রণা। দরজা বন্ধ করে, ভালো করে সেজে, চুল আঁচড়ে, চোখে সুর্মা দিয়ে, গায়ে গন্ধ মেখে চানাচুর দিয়ে কাচের গ্লাসে ঢালা ফলিডল। আঃ মুক্তি! মুক্তি! আকিল নেই, আনসার নেই, শাগির নেই। তাকে কোনো কিছু বলার মতো কেউ নেই।

হয়ত আনসারের কোলেই মাথাটি রেখে, গাড়ির সিটে। নয়ত আরও কারোর কোলে মাথা, মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, গাড়ির সামনের সিটে বসে বসে লাল কাপড় দোলাচ্ছে কেউ—জানান দিচ্ছে ট্রাফিক আর অন্যান্য পথচারী, বাস, লরিদের—আমাদের রোগী আছে। সরে যান। সরে যান। ইমারজেন্সি। আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি। জীবন-মরণ সমস্যা।

স্টিয়ারিং ধরলে আনসার যে কোনো গাড়িতে ঝড় এনে দিতে পারে। সেই লালচে কাপড় উড়ছে। আনসার কঠিন হাতে স্টিয়ারিংয়ে, আমরা উড়ে যাচ্ছি ভাঙরে। সবাই বলছে, ইস্, মেয়েটা শেষ অব্দি বিষ খেল। আকিল ওকে ঘরে নেয় না। আজ অব্দি ঘর হলো না মেয়েটার। আনসার, শাগির ওকে ধোঁকা দিল।

গাড়ি ছুটছে, উড়ছে। আনসার লোক মানছে না। ট্রাফিক মানছে না। ভাঙর আর কতদূর! আমার যে বড় কষ্ট। বিষে সারা শরীর জ্বলে যায়। হায় আল্লা! আমার কি হবে! গলা শুকিয়ে কারবালা। হায় আল্লা! একটু পানি। পানি। আমি যে দোজখে যাই, চারপাশে জাহান্নামের হা-হা আগুন!

শীতের চাঁদমাখা পুকুর তেমনই স্থির। রহিমা তো ঘাটের কাছে এগিয়ে এসেছে আরও। যে হিমটুকু চাঁদে, চরাচরে, পুকুর জলে, বেলফুল ক্ষেতে—তা রহিমারও শরীরে নামছিল। তার মাথায় চাদরের ঘোমটা টানা। রহিমা জল পেতে চাইছিল। অন্ধকার, শীতল জল। জলে নেমে যাওয়া, এক পা এক পা করে। তারপর লাশ হয়ে ভেসে ওঠা। তখন তো কোনো অপমান নেই। কবরে, শান্তিতে ঘুমোব। সেখানে আনসার নেই, আকিল নেই, শাগির নেই। এভাবে চিত হয়ে ভেসে থাকা, জ্যোৎস্নার রেণু গায়ে মেখে। সুখে।

রহিমা সেই সুখকে পেতে চাইছিল। চাঁদ তাকে শীতল-আলোয় রেখেছিল।

অনেক রাত অব্দি সিনেমা ছিল ভি সি পি তে। জীবন কেন রাজবব্বর, অমিতাভ, কামাল হাসান, শ্রীদেবীর হয় না! সব মিলমিশ

হয়ে যায়। কোনো দুঃখ থাকে না। গানে গানে তিন ঘণ্টা পার হয়ে যায়। অনুপম খের, অমরীশ পুরী শেষ অব্দি হারে।

অনেকক্ষণ ধরে চোখটান করে ভি সি পি দেখলে তারপর সব কিছুই যেন আবছা লাগে। মেঘলা মতো। আমি তো শ্রীদেবী বা রেখা হতে পারি না। আমি যে রহিমা। হলে গিয়ে সিনেমা দেখা হয় না, তবু ভি সি পি-র রঙিন উৎসবে, তেমন তো মন্দ লাগে না। তবে বড় শরীর পোড়ায়, আকিলকে মনে পড়ে।

কোন চিন্তার টানে সে যেন একেবারে জলের কিনারা নিয়ে দাঁড়ায়। তার চাদর মোড়া, বেঁটে, মাংসময় শরীর আছড়ে পড়ে জলেই, ছায়া হয়ে। পায়ের বুড়ো আঙুলে জলের স্পর্শ লাগে কি লাগে না! সে শীতলতায় শিউরে ওঠে। আর এই শারীরিক কাঁপন থেকে তার ছায়াও ভাঙে। নিজের শরীরের প্রতিটি আনন্দ বিন্দুকে একে একে বিসর্জন দিতে চেয়েছিল রহিমা। কিংবা এক সঙ্গেই সবগুলোকে।

মরণ কি এমনই ঠাণ্ডা! নিজের কাছে নিজে জানতে চায় রহিমা। জল স্থির থাকে। তার বুকে চাঁদ ভাসে। ছায়া কাঁপে কি কাঁপে না।

রহিমা জীবনে ফেরে।

এই নিজে নিজে ঘুরে আসার ভেতর, যে পথ সে পেরিয়ে এসেছিল, আবারও পেরিয়ে যাবে—সেটুকু সময়ে তার দু চোখে কান্না জমে যায়। সেই কান্না হয়ত কুয়াশায় জড়ায়, তাকে আরও ভারি করে। রহিমা বুঝতে পারে না।

আজ দুপুরে, যখন সবই এরকম তরঙ্গহীন, উঠোনে নিয়মের ধান ঝাড়াই, হেমন্তের টাল দেয়া খড় রোদে তার বুক থেকে গত রাতের হিম শুকিয়ে নিতে পারে। সেই খড়ে ধান খোঁজে হাঁস, মোরগ-মুরগি। পাঁচিলে ছুটে যাওয়া কাঠবেড়ালী তার সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে দেখে কিচ্-চ্ করে যেন বা পাখি হয়ে ডেকে ওঠে। এই ডাকটুকু বিঁধে যায় রহিমার বুকে। সে তো পাখি ভেবেই চোখ ফিরিয়েছিল। কাঠবেড়ালী ততক্ষণে পাঁচিল পেরিয়ে নারকেল গাছের বুক বাইছে। কিন্তু পাখির বিভ্রম জাগানো তার ডাকটি তখনও হাওয়ায়।

পুকুরে হাঁসেরা সাঁতারে ছিল। উঠোনে ডানায় আগলানো বাচ্চারা মা-মুরগি থেকে একটু একটু দূরে যেতে শিখেছে। বেড়াল বা কুকুর দেখলে তারা নিজেরাই ছুটে পালাতে পারে। কাক দেখলে ভয় পায়

না। তবুও মা-মুরগি তাদের ডানার আড়ালে রাখতে চায়। পায়ের নখে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পোকা বের করে। নিজে দুব্বোর কচি ডগা খোঁজে।

ঝুঁটি ফোলানো অহংকারী মোরগ তার অহংকার নিয়ে মাঝে মাঝেই বাং দেয়—ডেকে ওঠে। তার গেরস্থালীর গিন্নিরা সেই শব্দে নড়ে চড়ে বসে। তাদের হয়ত নিজেদের সন্তান, ডিম—এসবের কথা মনে পড়ে। অ্যালুমিনিয়ামের ছোট হাঁড়িতে কুঁড়োর ভেতর হাঁসের আর মুরগির ডিম সাজানো হতে থাকে। বাজারে বিক্রির জন্যে। এই পয়সাটুকু—যে মেয়ে বা বৌয়ের হাঁস-মুরগি, তার। অ্যালুমিনিয়মে হাঁড়ির নিচে কুঁড়োর বিছানায় টাটকা সাজানো সব ডিম, বাবুরা যত্ন করে খাবেন।

রোদ্দুরে চাদর মুড়ি দিয়ে রেশনের চাল বাছাই হয়। গম ঝাড়াই। কলকাতায় বাসন মাজা—ছাই ঘষার ক্লান্তি জাগানো শব্দ। জল তোলা। গোরু-ছাগলদের খেতে দেয়া। মুরগি-হাঁসকে ভাত-কুঁড়ো। এসবই রহিমার আশেপাশে অন্দরমহলে। সেখানে খবরের কাগজ নেই। নাম সইও নেই অনেক সময়। বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়ার পাট নেই। তবে রেডিও খোলা থাকে সারাটা প্রহর। ট্রানজিস্টারে অবিরাম—চশমা মার্কা অম্লজিন চূর্ণ, বোরোলীন-এর সংসার, এ সি বেল-এর গানের আসর, শনিবারের বারবেলা। নয়তো যাত্রার কোনো বিজ্ঞাপন-বাণীতে—আসুন, দেখুন—অসুর নিধন যজ্ঞ। মঞ্চে জীবন্ত আফ্রিকান সিংহ, শম্ভু। সুপার সাইক্লোরামার সুপার বিস্ফোরণ। জাপানি টেকনিকের আলো। রাশিয়ান পদ্ধতিতে ডবল স্টেজ। মঞ্চে স্বর্গ থেকে দেবতাদের মর্তে অবতরণ। যে নায়েক বন্ধুরা এখনও যোগাযোগ করেন নি, তাঁরা অবিলম্বে আমাদের গদিঘরে আসুন।

আবার এমনও হয়—'গরুড় মাতা বিনতা'। মঞ্চে আলোর মায়ায় সাপের খেলা। কিছু নারী অথবা পুরুষ কন্ঠ। কান্না ও পৌরাণিক অট্টহাসি। সঙ্গে মিউজিকের ঝনৎকার।

আমাদের বাল্যে 'রূপবান'-এর গান কি এমন ছিল! সে তো এখন স্বপ্নে। সেই বারো বছরের কন্যার বারো দিনের প্রেমিক। রহিমা ভাবে।

আবার রহিমা শোনে, ভুল পৃথিবী—পালা রচনা-নির্দেশনা নটসূর্য ....অভিনয়ে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রখ্যাত....গদীঘরে ভিড় এড়ানোর জন্যে নায়েক-বন্ধুরা আজই যোগাযোগ করুন। রহিমা এসব শুনতেই থাকে, শুনতেই থাকে। এরই ফাঁকে ফাঁকে কখন যেন গাভিন ছাগলের চিৎকার মিশে যায়।

কপি পাতা, গাজর পাতা এই শীতে ধাড়ি ছাগলটি বড় আরামে খায়। তার বাচ্চারা নরম রোদ গায়ে মেখে আরামে তিড়িং-বিড়িংয়ে মন দেয়। তারপর ছুটে এসে মায়ের স্তন ছুঁয়ে ফেলে মুখ দিয়ে বড় আরামে জীবন-রস টেনে নিতে থাকে।

নতুন গাভিন হওয়া ছাগলটিকে বড় যত্নে রাখতে চায় এবাড়ির গিন্নি চাঁদবিবি। ফ্যানটুকু ধয়ে দেয়। আহা প্রথম বিয়েন। বড় কষ্ট। ভয়। পাল খাওয়াতে নে যাওয়ার সময় কিছুতেই যাবে নি, মাগির ঢং কত। বড় তাগদদার পাঁঠা। যতবার চড়তে যায়, হাঁটু মুড়ে এ ঢেমনি বসে পড়ে। তারপর এক সময় গরম নামল। চাঁদবিবি এসব আপন মনেই বলে। গাভিন ছাগলের পেটটি বেশ পুরুষ্টু। তাগড়া বাচ্চা হবে এমন আশা চাঁদবিবির।

'রূপবান' শুনছি সিনেমায় আসছে—এমন ভেবে রহিমা শ্বাস চাপল।

পুকুর ঘাটে শক্ত ঝুড়ি উপুড় করে, কাঠের পাটা ফেলে এ সংসারের বৌ-দের কাপড় কাচা। ধাঁই ধপাধপ, ধাঁই ধপাধপ পিটুনি। কাপড়-গুটনো ফর্সা উরু, শ্যামলা উরু, পায়ের গোছ ছায়াছবি হয়ে জলে। সাবানমাখা কাপড় আছড়ানো নারীর ভারি বুক জলে বসে যায়, ভেসে ওঠে। জল লজ্জা পায় না।

এভাবে না হাঁপিয়ে অবিরাম কেচে চলা। একটু থেমে, শরীর জিরিয়ে নিচু হয়ে আবারও আছাড়। আছাড়। এসবই নিয়মে, সাপ্তাহিক কাজের রুটিনে। সকালে, আঁধার থাকতে ওঠো। হাঁস-মুরগি, গোরু-ছাগল বের কর। তাদের মাঠে নিয়ে খোঁটায় বাঁধবে বাড়ির কাচ্চারা। হাঁস জলে নামবে। মুরগি খাবার খুঁটবে। বাসন মাজ, রান্না কর, লোক খাওয়াও। ঘর মোছ, রান্নাঘর সাফ কর। এসবই চাঁদবিবি দেখবে। রোকেয়াবিবি দেখবে।

রেডিও থেকে আসা 'সতী পেলনা সিঁদুর' যাত্রার বিজ্ঞাপনের গান-শব্দ রহিমার ভেতরে বসে যাচ্ছিল। কাঠবেড়ালী আবারও যেন দূরে কোথায় ডাকল কিচ্—কিচ্চ। তবে কি খড়ের গাদার আড়ালে, নাকি নারকেল গাছের মাথায়! রহিমা দেখতে চাইছিল।

চাঁদবিবি আপন মনে বজ বজ করতে করতে গাভিন হওয়া লাল ছাগলটির যত্ন করছিল। পুকুর ঘাটে কাপড় কাচার শব্দ। সেই

জলতরঙ্গে কোনো মোচার খোলা নৌকো হয়েই ভেসে যাচ্ছিল একলা একলা। হাওয়ার টনে হাঁসেরা কেউ কেউ ডুব দিয়ে গেঁড়ি তুলছিল।

রান্নাঘর থেকে রসুন-পেঁয়াজ সম্বার দিয়ে ছোলার ডালের গন্ধ পাচ্ছিল রহিমা। আজ লাউ দিয়ে গোস্ত হচ্ছে। গাছের লাউ। কালকে তারা ফুলকপি দিয়ে গোস্ত খেয়েছিল। আর ছোট ছোট টুকরো করা গোস্ত মুসুর ডালে ফেলে দিয়ে ডাল-গোস্ত। কতদিন চিংড়ি মাছ খাওয়া হয় না। এই শীতে পেঁয়াজকলি দিয়ে মাখা মাখা চিংড়ির ঝাল। রহিমা তার জিভে ঘনিয়ে আসা লালার টান টের পেল। লোভে রসনা রসসিক্ত হয়।

শরিয়তি মতে চিংড়ি, কাঁকড়া, কচ্ছপ—সব না-জায়েজ। যা হালাল করা যায় না, তাই তো খাওয়া বারণ। তবু তো চিংড়ি-তরকারিতে লোভ জাগে। রহিমার মনে পড়ল কয়েক মাস আগে চাঁদবিবির হাতে রাঁধা পুঁই-মেটুলির কথা। তাতেও চিংড়ি ছিল।

এই শীতে বটতলা বাজারে নানান মাছ। বোগো, গাং-বোগো, মৌটি, উল্‌কো—চ্যাং, সীতেহার, সার্ডিন, আমোদি, নে-হাড়ি, লটে—ম্যাকরেল, কুঁজো-ভেটকি। ভোলা-ভেটকি, রুই কাতলা মৃগেল—এসব তো আছেই। চাঁদবিবি—আমার খালা একটু বেলায় আমারে বাজারে পাঠাল আমি সব রকম মাছ আনি। গাং-বোগোর নীল কাঁটা। ভালো করি পিঁয়াজ রসুন দে, নংকা বেটে মিশিয়ে রান্নার পর কী সোয়াদ। কাঁটা দেখি, কেউ খেতি চায় না। আমি সব খাই। গরীব সব খায়।

রহিমা এই দুপুর বেলা তার পাশে জমে থাকা উকুন-বাছানি কাচ্চা-বাচ্চা, মা-বৌয়ের মাঝে যেন বা খণ্ড দ্বীপভূমি হয়ে বসে থাকে।

'আকিলটা একেবারেই বৌ-চাপনা নয়', এসব কথা তাকে জটিল ফেরে ফেলে। সে অপমানে মাটিতে, গভীরে প্রবেশ পথ খোঁজে। কিংবা আনসার বা শাগির প্রসঙ্গে আড়ে-ভিড়ে যখন তাকে কেউ বলে, 'নিকের মাগ আর ঠিকের জমি কোনোদিন এক হয় না।' সে তো তখনও আড়ালে চোখের জল ফেলে। একা একা। এমন কি সঙ্গীদার মা, সাম্মাদ-আম্মাদের মা, দারোগা-বুড়িও বলে, তোরে আকিল নেয় না! রহিমার মাথা নিচু করে সরে যাওয়া ছাড়া কোনো রাস্তা থাকে না।

কোনো স্তব্ধ দুপুরে, তখন সবে হেমন্ত গেছে—আনসার তাকে বলেছিল, একলা ঘরে বড় শীত করে। ওপর থেকে অ্যাসবেস্টসের চাল

ফুঁড়ে যেন ঠাণ্ডা নামে। কি শীত কি শীত। কাঁথাকানি গা হাত সব কবরের মতো ঠাণ্ডা। তুমি আগুন-মালসাটি হয়ে শোও না আমার পাশে—

সে নসিব কি আমার আচে যে তুমি আমারে ঘরে নেবা !

আল্লার কিরে—তোমারে আমি

থাক, অনেক হলো। রহিমা নত হয়! যেন বা আভূমি অবনতা কোনো বৃক্ষ, অথবা আবহমানের নারী—হে পুরুষ তুমি সর্বশক্তিমান। আমায় তুলে ধর। ধর গো।

রহিমার মনে পড়ল, চাঁদবিবির শাশুড়ি পরীযানবিবি এ অঞ্চলে বিচারে বসতেন। হাতে থাকত বেতের লাঠি। বাবর আলি পুরকাইত, সফদার আলি ভাঙি, ইদ্রিশ বাগানি, ইউসুফ—মুখে মুখে যা এছুফ্ সর্দার—এঁরা সবাই বিচারে বসতেন। তখন বিচার মানে শুধু টাকা জরিমানাই নয়। কান ধরে ওঠবোস। নাক খত—রাস্তায় সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে, সকলের সামনে! নয়তো বেতের ঘা।

পরীযানের কাছ থেকে শেখা একটা কথা চাঁদবিবি এখনও বলে, 'জান যায় ভিখ্ করে খাব কোনো শালার কাছে যাব না।' রহিমা কি তেমন করে কোনোদিন বলতে পারবে! আকিলের মুখের ওপর, আনসারের মুখের ওপর ?

হাওয়ায় আবার রান্নার স্বাদু ঝাঁঝ ভেসে এলো। বেলা বারোটা প্রায় বাজে। সেই একই রকম, কাজ, গজালি, পরচর্চা, কাজ—সন্তানের জন্ম দেয়া। এভাবেই অন্তঃপুরের দিন যায়। ইদানীং রেডিওর গানে-নাটকে, টি. ভি সিরিয়ালে, কখনও বা ভি সি পি-র আর্তনাদে এখানে ঢেউ ওঠে। মুছে যায়! বা বড় জোর কেউ যদি আরও একটি বিবি আনে, তাও তো মানিয়ে নেয়াই হয়ে যেতে থাকে, অভ্যাসে।

খাওয়ার পর হয়ত অলস-নিদ্রায়। নয়তো স্বামী অথবা ভালোবাসার মানুষের চুপি চুপি গল্পে দিন যায়। সেই একই প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে। শাগিরের বোন জামিলা হয়ত হাতের উল-কাঁটা নিয়ে পাশে এসে পা ছড়িয়ে বসবে। হাতও চলবে। মুখও নড়বে। কি কি আদি-রসিকতায় বজকে ওঠা হাসি নিয়ে জামিলা হয়ত তার শরীর ভাঙবে এক সময়, রহিমার শরীর ঘিরে।

ভাত খেয়ে উঠে শীত পায়। রহিমার তার পাতের শেষটুকু পুকুর

পাড়ে নামিয়ে দিচ্ছিল। সেই বিশাল জল—শীতে যার গভীরতা কমেছে, তা কাল রাতে তাকে ডেকেছিল, এখন তেমনই রৌদ্র-আচমনে স্থির। শুধু কোথাও কোথাও হাঁস-তরঙ্গ। রহিমা পুকুরে নিজেকে দেখল। পুকুর পাড়ে এখনও কপি পাতা, মুলো শাক, দু এক কুচি ধনে পাতাও। গাজর ধোয়া হবে এখন। রহিমা কুকুর-মা আর তার তিনটি নবীন ছানার জন্যে বাটি উপুড় করে দিল। বাঁশ পাতা, নারকেল পাতা, তেমনই জল-ছুঁই খেলায়।

আমি আর ব্রহ্মপুরে থাকব না। কোথাও চলে যাব। কোনো দূর নিরুদ্দেশ-অন্ধকারে। গতরে খেটে খাব। এখানে পড়ে পড়ে বাজার করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, মুরগি-হাঁস খেতে দেয়া, ছাগল-গোরুকে খাওয়ানো, তাদের মাঠে বেঁধে আসা কোনো কোনো দিন—এতো পেট খোরাকির ঝি। আমি এ অপমানের ছবি থেকে বেরিয়ে যাবই যাব। কেউ হয়ত খুবলে খাবে। খাক। এখানে তো আনসার খুবলোয়, শাগির খুবলোয়। ওখানেও নয় আর কেউ! ভাবতে ভাবতে হাতের উল্টোপিঠে চোখের কোল থেকে জল মুছে নিতে পারে রহিমা।

দূর থেকে চাঁদবিবির গলা শোনা যায়, তাকে ডাকছে।

চৌদ্দ

কানে ওয়াকম্যান লাগিয়ে কাজ তদারকিতে ছিল আনসার। বড় ভ্যানটির তলায় আক্রাম, নতুন করে কাজে লাগা বডি মিস্ত্রি ওয়াসিম। রাতে ভালো ঘুম হয় নি আনসারের। ওপর থেকে, অ্যাজবেস্টসের চাল ফুঁড়ে যেন বা হিম নামে টুপিয়ে টুপিয়ে। নিচে থেকে উঠে আসে ঠান্ডা। ঘরের মেঝেয় রাখা গাড়ির সিট, লাইট, আরও ছোট খাট স্পেয়ার পার্টস। মাথার কাছে ধূপদানি। মেঝের ওপরই এলোমেলো রাখা চটি, শু্য, মোজা, টুথপেস্ট, ব্রাশ, হরলিকসের শিশি, কমপ্লানের কৌটো। ঘরের মেঝে আর আনসারের জীবন একই রকম এলোমেলো।

সাগর দ্বীপ থেকে আসা বড় ভ্যানের নতুন বডি হবে। তারপর রং। হাজার বিশেক টাকার কাজ। আনসার সামলাতে পারছে না। যত ডেলিভারির দিন এগিয়ে আসছে, তার রাগ বাড়ছে! সঙ্গে মুখ খিস্তি।

পাতা মুড়িবেন না।

পলিথিনের বাজার করা ব্যাগে অর্ধেক টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে গেছে উমাধর সিং। বিহারি রাজপুত। সাগর দ্বীপে গাড়ির ব্যবসা। পি ডব্লু ডিতে খাটে। এটা হলে আর একটা জিপ রিপেয়ারিং আছে। উমাধরেরই। সেটাও বড় টাকার কাজ।

আজই সকালে মোটর সাইকেলে ধুতি-শার্ট, তার ওপর সোয়েটার পরা উমাধর এসেছিল। সোয়েটারের গায়ে গলাবন্ধ প্রিন্স কোট। তাতে জড়ানো শাল। মাথায় হনুমান-টুপি। পায়ে নীল মোজা, ফিতে বাঁধা বুট। সেই কোন ভোরে বেরিয়েছে।

উমাধরের কাজ এর আগেও করেছে আনসার। পুরনো পার্টি।

গাড়ি ডেলিভারি দিতে কাকদ্বীপ, নামখানা, কচুবেড়িয়া, হারউড পয়েন্ট—এমন নানা নাম পেরিয়ে যেতে আসতে হয়েছে।

আকাশে শীতের চমৎকার রোদ। এতে বডি রং খুব তাড়াতাড়ি হবে। উমাধরকে ঘরে বসিযে রেখে এসেছে আনসার।—উমাধরদা, আপনি তো আমাদের ঘরে ভাত খাবেন না। আনসার তার ঘরে আগেকার মতোই বিনয়ের ঝাউ গাছ হয়ে যাচ্ছিল। অ্যামবাসাডারে লাগানো হবে ফোমের এমন নতুন গদির ওপর পা তুলে বসে উমাধর। আনসারের কথায় তার চর্বি লাগা পুরুষ্টু ঘাড়টি নাড়ল কি নাড়ল না। আর আনসারের মনে হলো, তার ঘরে জায়গা নেই। না হলে একটা চেয়ার-টেবিল ফেলতে পারলে কাজের সুবিধে হতো।

তা হলে মিষ্টি আনাই। নতুন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা—অ্যাই আক্রাম, দিলীপ, বাবুয়া—একই নিশ্বাসে কথাগুলো বলতে পারে আনসার। যেমনটি সে সব সময়েই বলে থাকে।

না রে থাক। সকালে খেয়ে বেরিয়েছি। উমাধর যেন এড়াতে চায়। তার দাড়ি-গোঁফ কামানো গালে আনসারের অ্যাজবেস্টস চোঁয়ানো আলো।

আনসার বোঝে এ লোকটি মুসলমানের ছোঁয়া মিষ্টি পর্যন্ত খাবে না। তাই সে বারবার যেমন করে থাকে, বলে, চলুন, দোকানে গিয়ে বসি। মিষ্টির দোকান বাঙালির—আপনাদের জাতেরই।

উমাধর নড়ে ওঠে।

এ নাটক তো দুপুরে হয়ে গেছে। তখন ছিল দুপুরের প্রথম দিক—এই বেলা বারোটা একটা। টাকা দিয়ে উমাধর চলেও গেছে।

এখন কাজটুকু বুঝিয়ে বাঝিয়ে মিস্তিরিদের দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। আনসারের মনে পড়ল উমাধর তার সঙ্গে মিষ্টির দোকানে গেছিল। সেখানে রসগোল্লা, দই, নলেন গুড়ের সন্দেশ—আনসার আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি রাখে নি।

বুঝলি মেজদা, মাসুদ খুব দৌড়চ্ছে ওয়ারলেস, কাজের ব্যাপারে।

ওয়াকম্যানের সঙ্গীত ধ্বনির ভেতর দিয়ে এটুকু আনসারের কাছে পেঁছে গেল।

সে জানে সেই মারপিটের দিনে মাসুদের রণধ্বনি। মার মার, মেরে ফেল শালাদের। বড় দাদা হয়ে গেছে সবাই, না! দাদাগিরি ছুটিয়ে দেব।

কথাগুলো অপমান হয়ে আনসারের মাথার ভেতর ছুটোছুটি করছিল। বাতাসে এখন রঙের গন্ধ, থিনারের ঘ্রাণ। রং মিস্তিরি সুরেন দেবনাথ স্প্রেয়ারের মুখে কাপড় লাগিয়ে অ্যামবাসাডারের গায়ে রং ছুঁড়ছে। গম্ভীর স্টিল-গ্রে রং একটু একটু করে ফুটে উঠছে গাড়ির গায়ে।

আর তখনই মোটর বাইকে কল্যাণ বক্সি এসে যায়। তার ইঞ্জিনের ধক ধক শব্দ ওয়াকম্যান থেকে ভেসে আসা গান পেরিয়ে পেঁছে যায় আনসারের গভীরে।

আমার ডিজেল জিপটা!

এখনও ইঞ্জিন বাঁধা একটু বাকি আছে। কান থেকে ওয়াকম্যান নামিয়ে একটু এগিয়ে এসে আনসার বলে।

আর হবেও না। সব ঢপের চপ। অ্যাডভান্স নেয়ার বেলায় তো—

মিস্তিরি কামাই করলে কী করব বলেন তো! আনসারের হাল-ছাড়া গলা।

কি আর করবি! আমাদের ঘোরাবি। গ্যারেজে গাড়ি যখন ঢুকিয়েছি—তা কবে পাব বল?

সামনের সোমবার।

রবিবার করা যায় না।

হবে না কল্যাণদা। আনসার বিনয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়া তার কিছু করারও থাকে না।

দ্যাখ। বিল দিয়ে আবার তাড়া দিস না—বলতে বলতে কল্যাণ

বাইকে লাথি মারে।

যান্ত্রিক ভট ভট শব্দে চারপাশের পৃথিবীটুকু কেঁপে যায়। যুব কল্যাণ সমিতির সামনে যে বুজে আসা ডোবা, সেখানে ফেলে দেয়া কপি পাতার পচাটে গন্ধ বাতাসে ছড়ায়। আনসার তার গালের খৈনির থুথু মাটিতে নামিয়ে দেয়।

সেই কচুগাছ, কালচে জল, ম্যালেরিয়া লতার অন্ধকারে রেহনা আর রোকেয়াবিবির মুরগিরা খাবার খোঁজে।

এই কাজে এত অপমান, এত কথার খেলাপ। হপ্তার পেমেন্ট পেলেই মিস্তিরিরা নাগা—কামাই করে। আমার আর কিছু করার থাকে না। বালিগঞ্জের বোর্ড অফিস, মুর অ্যাভিনিউয়ের ওয়ারলেস, প্রাইভেট পার্টি, কারোরই কথা রাখা হয়ে ওঠে না। খিঁচুনি খাই। বিল আটকে থাকে। অনেকেই বলে, মোল্লার ছেলেদের কথার দাম নেই।

এসব ভাবতে ভাবতেই আবার নিজস্ব ওয়াকম্যানে কিশোরকুমারের হিট গানে ফিরে যায় আনসার। জীবন তো দুদিনের—খাও পিও জিও—ইয়াহু।

আক্রাম, ওয়াসিম, দিলীপ, বাবুয়া, সুরেন দেবনাথ গোটা দিন ধরে গাড়ির খেজামতে থাকে। একাজ, সেকাজ, ডোর লক, সিলিং লাইট, ব্যাক লাইট।

এর মাঝে আনসার আবিষ্কার করে তার গ্যারেজের অ্যাসবেস্টস চালে বাবুয়া। শুকিয়ে যাওয়া মরা ধুঁদুল-লতার গা থেকে শুকনো ফল টেনে ছিঁড়ছে।

অ্যাই, কী হবে রে!

রহিমা-বুবু চেয়েছে।

আনসার চুপ মেরে যায়। এই একটি নামই তার বেদনা বাড়িয়ে দিতে পারে। সাবান মাখার গা ঘষানি ছোবড়াটি হবে এই শুকনো ধুঁদুলের জালিতে। রহিমা গায়ে গন্ধ সাবান মাখবে—তার সুবাস। আনসার মনে মনে কল্পনা করে—এ সুঘ্রাণ তো আমারই—এই ভেবে সে চোখ বুজে নিতে পারে।

অন্য সময় হলে বাবুয়া নির্ঘাৎ খিস্তি খেত। হয়ত চড়-চাপড়ও। —শালার ঢিটে গোরু। সোগো—তোদের জন্যে পার্টির কাছে খিস্তি, কিংবা আরও কিছু কিছু। সে সব কিছুই এখন শোনা যায় না।

বরঞ্চ আনসার বাবুয়াকে বলে, আস্তে আস্তে নামিস বাবু।

অ্যাসবেস্টস থেকে নামার সময় বাবুয়া কয়েকটা খোসাসুদ্ধ পাকা সুপুরিও কুড়িয়ে নেমে আসে। ধুঁদুলের শুকনো জালি তো আছেই। এগুলো তোমার নানিকে দিয়ে আসি। পান খাবে—বলে তেল-কালি-মাখা হাতের ভেতর খোসাসুদ্ধ সুপুরি নিয়ে বাবুয়া দৌড়ে তার মামার বাড়ির অন্দর মহলে চলে যায়।

আনসার এক অপার জীবন-রহস্যের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ব্রহ্মপুর জামে মসজিদে তবলিগ-জমাত এসেছে। বর্ধমান আর মেদিনীপুর থেকে। প্রায় দিনই এঁদের দাওয়াত থাকবে বাড়ি বাড়ি। তবলিগ করা মানুষদের যত্ন করে পাঁচ পদ রেঁধে খাইয়ে পুণ্য অর্জন করার ধারা চলে আসছে বহুদিন। সন্ধ্যার মুখে লুঙ্গি টুপি হাঁটুঝুল পাঞ্জাবি গায়ে তবলিগের মানুষেরা মসজিদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের কেউ কেউ বয়স্ক, কম বয়েসীও আছেন। চিল্লার পর চিল্লা চলে যাচ্ছে। ঘরে ফেরা আর তেমন করে হয় না। ফিরলেও আবার দীনের দাওয়াত নিয়ে বাইরে। কেউ কেউ যে বাড়ি ফিরে সংসারে একেবারে থেকে যান না, তা নয়। তবে পরিক্রমায় মানুষ বাড়ে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রচার চলে। দীনের দাওয়াত দিয়ে বক্তৃতা হয়। এঁদের অনেকেরই ঘর ভাসে। বিবি অন্যের বাড়ি খাটতে চলে যায়। ছেলেরা গোরু বাঁধে।

লোডশেডিংয়ে মসজিদের সামনে অন্ধকার। তবলিগে আসা মানুষদের শাদা টুপিগুলো শুধু দেখা যাচ্ছিল, একটু দূরে দোকানে জ্বলে ওঠা জেনারেটরের আলোয়।

গ্যারেজে কাজ হচ্ছিল। ওভার টাইম হবে। তারে লাগানো দুশো ওয়াটের ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে জিপের ইঞ্জিন বুঝতে চাইছিল আনসার। তাতে আলো যেমন ছিল, পাশাপাশি ছায়াও।

এখনও যুব কল্যাণ সমিতির ঘর খোলে নি। আনসার দেখতেও পেলনা তার দুশো ওয়াটের বাল্বে ছ্যাঁকা খাওয়া একটি রঙিন মথ মুখ থুবড়ে জিপের গায়ে লেগে থাকা হালকা হিমে জড়িয়ে গেল।

মোড়ের মাথায় আম্পিয়ারের চা-দোকানে এসে মসজিদের সামনে অন্ধকারে জেগে থাকা তবলিগের লোকজনদের দেখে ফিরে গেল

আনসার। তখনই তার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। আব্বা—বাবা তো আমাদের জন্যে কিছু করে নি। এমনটি ভেবে নিয়ে আনসার ফিরে আসে। গ্যারেজে চারটে চা পাঠাস, এটুকু সে আস্পিয়ারের দোকানের ছেলেটিকে বলে—

দোকানে এখন কেউ নেই, খেয়ে যাও।

ধ্যাস সোগো, তোর মালিককে বলবি পেঁছে দিয়ে আসবে। বলতে বলতে আনসার দোকান ছাড়ে।—আমার আব্বা তো এ ভাবেই দিনের পর দিন ধর্ম করতি আজ এ মসজিদ কাল ও মসজিদ করি বেড়ায়। আর আমরা কালি মাখি। আমাদের ধর্মে সব সময় দীনের জীবনে জোর দেয়া হয়েছে। আমার আব্বা কি সেই জীবনের খোঁজ পেয়ে গেছে? আমরা তার কেউ নই! আমার মা-ও তার কেউ না! ভাবতে ভাবতে আনসার নিজের মাথার চুল টেনে ধরে।

তেল-কালিমাখা আক্রাম গাড়ির নিচে থেকে বেরিয়ে আসে। তার পিঠের তলায় এতক্ষণ প্রাকৃতিক শীতলতা ছিল, হয়ত দু একটি ঘাসও। তবু আক্রাম মবিল, ডিজেল, পেট্রল, ক্লাচ, হ্যান্ড ব্রেক, ভ্যাকুয়াম—এমন নানা জটিল অঙ্কে ছিল। গাড়ির নিচে যে অন্ধকার ছিল, বাইরে তা যেন একটু ফিকে।

সূর্য ডুবে গেলে কাজ করলে সকলেরই ও. টি আছে। তার কোনো ওভারটাইম নেই। সে তো মিন্টু অটোমোবাইলস-এর ছোট মালিক। মেজদা না থাকলে অনেকদিনই মিস্তিরিরা পেমেন্ট পায় তার হাত দিয়ে। অবশ্য এর আগে মেজদা আনসার টাকা গুনে হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে যায়, কে কত পাবে!

আমার মাইনে নেই। ও. টি নেই। অনেক রাতেই সাইকেলে কামাল-গাজি যাওয়ার সময় গড়িয়া মোড়ে অটোঅলাদের ডাক শুনতে পাই—রক্ষিতের মোড়, কালিবাজার, বোড়াল, কামালগাজি। এসব জায়গায় যাওয়ার বাসেরা তার আগেই গ্যারেজ-বন্দী হয়েছে। সাইকেল প্যাডেলে চাপ দিয়ে চলে যেতে হয় কামালগাজির রাস্তায়।

মা আমার পথ চেয়ে থাকে, মেজদার খবর নেয়। এসব ভাবতে ভাবতে আক্রাম লাইফবয় সাবানের টুকরোটি নিয়ে সিমেন্ট বাঁধানো টিউবওয়েল তলায় যেতে পারে। সেখানে আলো নেই। গ্যারেজে কাজ করা আর সবাইও এখানে হাত ধোবে। আনসার ততক্ষণ গ্যারেজের

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার লম্বা ছায়া তালগাছের পাশ দিয়ে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে কল্যাণ বক্সির জিপের পাশে।

সবাই দাঁড়া। চা আসছে। চা খেয়ে, চা খেয়ে যাবি। নিজের অভ্যাসেই একটা কথা দু বার বলে আনসার।

সবজি ঠেকে তখন বাঁধাকপি, মুলো, পালংশাক, কাঁচালঙ্কা, টোম্যাটো, ফুলকপি, ওলকপি, শালগম, বীট, গাজর, কড়াইশুঁটি, ধনে-পাতা, মেথিশাক, সিম, বিনস, পেঁয়াজকলি আলাদা আলাদা ঝুড়ি বেঁধে পাইকারি বাজারে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ঠিক নটার পর শেয়ালদা কোলে মার্কেটে যাওয়ার টেম্পো এসে লাগবে। তখনই তাতে লাফ দিয়ে উঠবে ঠেকের লোকজন। মাল তুলবে। শিবু, সিরাজুল তাড়া দেবে মাল তুলে দেয়ার জন্যে।

আনসার এখানে দাঁড়িয়ে রোজকার এই চিত্রমালা মনে মনে দেখে নিতে পারে। তার গ্যারেজের কর্মীরা ততক্ষণে হাত ধুয়ে ফেলেছে।

পনের

নতুন হাটে ভিডিও-শো দেখাচ্ছিল আকিল। জায়গাটার এক-পাশে কাইয়ুমের মেডিকেল শপ—লাইফ। উল্টো দিকে বাচ্চাদের খেলনার দোকান। ম্যালেরিয়া লতা ঘেরা ফাঁকা এক চিলতে মাঠের ওপর টায়ার জ্বালিয়ে অগ্নির আয়োজন। শীতে, তাপবার জন্যে।

অনিল কাপুর, শ্রীদেবী, 'লম্‌হে', অমিতাভ বচ্চনের 'অকেলা' আর নানা পটেকরের 'প্রহার'। নানা, ডিম্পল, মাধুরী দিক্ষিত, হবিব তনবীর।

দু টাকায় প্রায় সারা রাত ধরে তিনটে সিনেমা। তাঁবুর ওপর হিম নামছিল।

বাইরে দাঁড়ানো সাইকেল, মোটর সাইকেল, রিকশা, অটোরিকশা—সবই ভিজে যাচ্ছিল হিমে। আঙুলে দিয়ে তাদের সিট কাচালে জল উঠে আসে।

নিজের ফুনাই ভিডিও মেশিনটি থেকে যৌবন, গান, লাস্য, ভায়োলেন্স উগরে দিতে দিতে আকিল ভাবছিল এরশাদ আমার দূর

সম্পর্কের মামা। কিছুতেই গ্যারেন্টার হলো না। হলেই আমি একটা ভিডিওকন মেশিন কিনতে পারতাম। তাহলে হয়ত একটা ঘর তুলে রহিমাকে নিয়ে—আমার শরীরটাও তেমন মজবুত নয়। রহিমাকে হয়ত আমি পারব না, ভয় হয়। তাই দূরে থাকি। রহিমাও দূরে—আজ খিদিরপুর, কাল ব্রহ্মপুর। তবু আমি ভাবি একদিন ঘরে হবে।

সবাই প্রথমে 'লম্‌হে' দেখতে চাইছিল, তারপর 'প্রহার'। অমিতাভর বাজার কী একেবারেই পড়ে গেল, নতুন বইও লোকে নেয় না! ভাবতে ভাবতে গলার মাফলার মাথা দিয়ে ভালো করে বেড় দিয়ে ছাড়িয়ে নিল আকিল। হাতের উল্টো পিঠে নাক দিয়ে গড়িয়ে আসা সর্দির জল মুছল। তার ব্যাগিজ প্যান্টের পায়া, মোজা, শূন্য পেরিয়ে ঠান্ডা শরীর পেয়ে যাচ্ছিল।

'লম্‌হে'-র সেই অসমবয়সী প্রেমের গল্প—শ্রীদেবী-অনিলকাপুর। প্রথমে মায়ের সঙ্গে প্রেম, পরে মেয়ে। আর 'প্রহার'-এ উগ্রপন্থী দমনে অ্যাকশানে থাকে নানা পটেকর—সঙ্গে স্বামীহারা ডিম্পলের হাহাকার, ফুটে ওঠা রাগী রাগী মাধুরী দিক্ষিত, কম্যান্ডো ট্রেনিং, বাপ রে, দম বন্ধ হয়ে আসে। তারপর নানার গলায়, 'জোকারস' বলে ডাক। কিংবা 'এ টু বাই টু'—আর সেই বাস থেকে উগ্রপন্থী ঘেরা মানুষ উদ্ধারের দৃশ্য! —এসবই দর্শক নেবে।

তাঁবুর বাইরে গরম চা-ঘুগনি, চপ, ডিম-পাউরুটি। কার্বাইডের আলো জেবলে তারা খদ্দের ডাকছিল।

মেশিন চালিয়ে আমি তো ঘুমোতেও যেতে পারি। ফড়িং আছে, ও সব জানে। বুঝে ঠিক করে নেবে। ক্যাসেট আটকে গেলে কী করতে হবে, রং বেশি হলে কী! ভাবতে ভাবতে আবারও নাক চুঁইয়ে আসা সর্দির জল হাতের উল্টো পিঠে মুছল আকিল। আমার আব্বা থামি—লুঙ্গি গাঁটের ওপর তুলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন। জায়েজ, না—জায়েজ মানেন খুব। কামালগাজিতে তাঁর সারের দোকান। আমি সারা রাত ভিডিও শো দেখিয়ে বেড়াই। গোটা সকাল চোখে ঘুম লেগে থাকে। সবাই বলে আকিল-ভিডিওঅলা। তবুও আজ আমার একটা ভিডিওকন নেই, যাতে ছবি ভালো আসে। পয়সা ভালো পাওয়া যায়। ফ্রিজ টি. ভি-র দোকানও করা হলো না। এখন ঘুরে বেড়ানো মাঠে মাঠে, এবাড়ি, ওবাড়ি, এপাড়া, ওপাড়া। শালা দুনম্বরী ক্যাসেট। জালি—

রং বেশি হলে বা ছবি কাঁপলে এসব কথা শাগিরকে শুনতেই হয়। সবই প্রায় লাইব্রেরি থেকে ভাড়ায় আনা। সেখানেও তো খালি জালি আর জালি। কত আর এক নম্বর দেবে! আকিলের ভিডিও-পাইরেসি শব্দটি জানা নেই, থাকলে সে এ বিষয়ে অনেক কিছুই বলতে পারত। কিংবা ভাবতে পারত। সে তো সাদা-সাপটা এক নম্বরী, দু নম্বরী জানে—

বাইরে হেমন্তের শীত লাগা রাত। আকাশে রোগা চাঁদ, কিছুটা বয়স্ক—হলুদ। আকিল গরম গরম চায়ের ভাঁড়ে উষ্ণতা খুঁজছিল। কাল রবিবার। গত পরশু ছিলাম বাঘারখোলায়, বোড়ালের কাছে—এক বিয়েবাড়িতে। ছেলের শাদি, তাই আনন্দ যেন একটু বেশি। রাতে গোস্-বিরিয়ানি খেয়ে পেট ফুলল, চোঁয়া ঢেকুর, অম্বল।

রাত নিজের নিয়মে ফুরিয়ে যাচ্ছিল। ভেতরে সিনেমাও। মাঝে মাঝে ছবি আটকে গেলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল—মালটা পানিতে চুবিয়ে আন। ফেলে দে।

ফড়িং এই সব খুচরো লজগজ সামলাচ্ছিল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাই উঠছিল আকিলের। এভাবে আর কত রাত? কত রাত? আকিল নিজের সামনে নিজেই দাঁড়িয়ে পড়ছিল, এই জিজ্ঞাসা নিয়ে।

ভেতরে তখন ছোট পর্দার মায়ামসলিনে অনিল কাপুর নবীনা শ্রীদেবীকে বুকে টেনে নিয়েছে। সঙ্গে কি এক সুর বুঝি উঠে আসছিল, ভাসছিল হাওয়ায়। আকিল ততক্ষণে নিজের ফাঁকা ভাঁড়টি বাঁশঝোপের অন্ধকারে গড়িয়ে দিতে পেরেছে।

রাতে ঠান্ডা নেমে আসা অ্যাসবেস্টসের নিচে কানে ওয়াকম্যান দিয়ে আনসার তার বিল-এর হিসেবে ছিল। কাল সকালে টাইপ করাতে হবে। তারপর পার্টিকে ধরানো। হিম উঠছিল মেঝে থেকেও। জেসমিন-গন্ধী ধূপের ছাই মেঝেতে ঝরে পড়ছিল নিজের নিয়মে। সুঘ্রাণটুকু ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করা বাতাসও ভারি করেছিল। আনসারের হাতের নখের গভীরে এখনও গ্যারেজের কালি, পায়ের নখেও। সাবান সবটুকু ময়লা তুলে দিতে পারে না। আনসার খুঁটে খুঁটে সেগুলো বের করতে চায়, আবার মন দেয় বিলে।

পাতা মুড়িবেন না।

ঠান্ডা লেগে চাবালি—দু গালের কষ ব্যথা হয়েছে। পেটের ভেতর, হাতের হাতের আঙুলে জিভের ডগায় এখনও নানির রান্না ডাল-গোস্তের স্বাদ, গন্ধ, আরাম। আরও দুখানা রুটি হয়ত নেয়া যেত। কিন্তু আনসারের সংকোচ থাকে। মামা বাড়িতে খাওয়া, তাছাড়া এই প্রায় রাত ফুরিয়ে আসা সময়ে আর কি রুটি চাওয়া ঠিক? আনসার ধন্দে থাকে, বিপুল জিজ্ঞাসায়। আর এই খিদে, বেঁচে থাকে, দিনযাপন ইত্যাদি প্রশ্নে তার নিজের আব্বাকে মনে পড়ে যায়।

আমি তো গড়িয়ায় 'মহুয়া' সিনেমার পাশে ৮০ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের উল্টো দিকে দরমার ঘরে গিয়ে বসি। খুব সস্তায় মেয়ে পাওয়া যায়, দশ টাকা। মোটে দশ টাকা। মাসি আমায় চেনে। সেও তো কতদিন হলো!

ফিলিপসের আলো জ্বলা বিজ্ঞাপন লাগানো দোকানে গান বাজে। ফুলের দোকান, জয়নগরের মোয়া-বাদাম চাকতির দোকান। উল্টো দিকে বিন্দু হোটেল। সেখানে এখনও সস্তায় গোস্ত-বিরিয়ানি। কাবাব, পরোটা, ভাত। বিরিয়ানি খেয়ে আকলিদের ঘরে বসা যায়। নিচু ঘর, অন্ধকার সরু গলি, নোংরা।

আমার দাদা আলাদা হয়ে গেছে বিবি-বাচ্চা নিয়ে, আমি গড়িয়ায় 'মহুয়া' হলের পাশে ঘরে গিয়ে বসি। অনেক রাতে বারুইপুর নরেন্দ্রপুর যাওয়া বাস ঐ গলির সামনে দিয়ে চলে যায়। আবার ফিরেও আসে। সেই জীর্ণ প্রাচীন ব্রিজটি সর্বংসহা হয়ে তার শরীরে স্থায়ী কাঁপন ধরে রেখে বুক পেতে গাড়িদের গ্রহণ করে। বাস, মিনি, অটো, লরি, টেম্পো, মোটর সাইকেল, স্কুটার। এভাবেই তো চলে আসছে।

গলির মেয়েদের ঘরে আমার নেশা জমে ওঠে। ইদানীং আকলি-পর্বের পর আমি গড়িয়ায় সে ভাবে যাই না। রহিমাকে পেয়ে আমার শরীর বাঁচে। সে কি নেশায়? সে কি ভালোবাসায়? সে কি জন্তুময় আশ্লেষই কেবল! আনসার হিসেব ভুলতে থাকে। ওয়াকম্যানের সুর তার মাথার ভেতর থেকে মুছে যেতে চায়।

আমার আব্বা তবলিগের রাস্তা বেয়ে বেহস্তে পেঁছিতে চায়। আমি রহিমার শরীর আঁকড়ে, তাকে পীড়ন করতে করতে যে সুখে ডুবি, তাতে যে আনন্দ তা কি বেহস্তের? নিজেকে খনন—একি না-পাক, সেরেক, না-জায়েজি। আমি জানি না।

জুম্মার নামাজে—সমবেত প্রার্থনায় আমি তো নিজেকে পাই। নাকি শুধুই অভ্যাস? যেমন রহিমাতে যাওয়া আসলে ভালোবাসা না অভ্যাস? আঙুলে জড়ানো ডাল-গোস্‌তের গন্ধ আবারও পেল আনসার। এর মধ্যে সে তার নানি—রোকেয়াবিবির ভালোবাসা খুঁজে পেল।

দূরে গ্যারেজের পাশ দিয়ে কোনো রাতচরা মোটর সাইকেল ছুটে যায়। তার শব্দে ছিঁড়ে গেল আনসারের এই সব জিজ্ঞাসা। ধর্ম নিয়ে যেটুকু হেঁটে আসা সে পথে চলতে চলতে আমি তো জেনেছি আমার ধর্মে আনন্দ আছে। আমি তো নাস্তিক নই। দোজখের আজাব, কবরের আজাব, কেয়ামতের আজাব-এ আমার ভয় আছে। তবু রহিমার সঙ্গে কেন আমি না-পাকিতে যাই, কেন? কেন? এসব ভাবতে ভাবতেই আনসার উঠে দাঁড়ায়। তার সেলাই করা লুঙ্গির কষি কোমরের কাছে আলগা হয়ে গেছে। বাইরে কুকুরের ডাক শোনা যায়। রাত এভাবেই বেড়ে যায়। ফুরিয়ে আসে জীবন।

আনসারের হাই উঠছিল। পাশের ঘরে সেন্টু শেখ গভীর ঘুমে। মুর্শিদাবাদের আরও কেউ কেউ এমনই। সেই গোলমাল, বিচারের পর থেকে যুব কল্যাণ সমিতিও বোধহয় আমায় পছন্দ করে না। সে ভাবে কথা বলে না কেউ? এড়িয়ে যায়। আমি কি এতই খারাপ! সেই আব্বাস আর ওমর। ওমর আর আব্বাস। ঘুরেফিরে ওদের সঙ্গেই ওঠাবসা। মাঝে মাঝে রাতে আমার ঘরে আব্বাস শোয়। আমার একা ভালো লাগে না।

বাইরে ঘুম জড়ানো চরাচর। আনসার ফিরে এলো। ঘরে।

ষোল

রান্নাঘরের উঁচু দাওয়ায় উটকো হয়ে বসে, কলাইকরা বাসনে খাচ্ছিল রহিমা। বেশ রাত হয়েছে। সামনে, নিচু মাটির মেঝেয় মাটি খুঁড়ে বানানো মাথা উঁচু করা উনোনের ওপর ঝুড়ি চাপা। যাতে না কুকুর এসে মাটি আঁচড়ায়। বেগুন দিয়ে মৌটি—মৌরলা মাছের তরকারি, ভাত। সকালের ডাল ছিল।

রহিমার হঠাৎই মনে পড়ল ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি কোনো একদিন আনসারের দাওয়াত ছিল। রান্নাঘরের সামনে এইখানে—এই নিচু দাওয়ায় মাটির ওপর থেবড়ে বসে ডালে ভাত মাখছিল আনসার। হাওয়ায় কাঁপা লম্ফের আলো। তাতে বাদলা পোকা। বড় বড় গরাস তুলে গালে ফেলছিল আনসার। কাঁচা লঙ্কায় কামড় দিচ্ছিল। আমি তোমায় পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছিলাম আনসার। তোমার ঘাড়ে, গায়ে, মুখে, কপালে ঘামের পানি। আমার কষ্ট হচ্ছিল। ভালো লাগছিল তোমার ঘামের গন্ধ।

দূরে অন্ধকারে, কোথায় যেন বৃষ্টি পড়ছিল কাঁঠাল পাতার ওপর। মৃদু শব্দ ছিল হাওয়ায়। আমার পাখা নড়ছিল কি নড়ছিল না। তোমার পাশে আমার দুই খালাতো ভাই সুজা আর শাহনওয়াজ খেতে বসেছিল। আমি ওদেরও হাওয়া দিচ্ছিলাম। আমার খালা তার শাউড়ি পরীযান বিবির শেখানো ছড়া—'ন্যাপ দিয়ে ছ্যাপ ঢাকা' মাঝে মাঝে বলে ওঠে। আমি তাই সবাইকে হাওয়া দিছিলাম। তোমার চওড়া পিঠ, চ্যাটালো কাঁধ দেখে আমার খুব ইচ্ছে করছিল। আকিলের কাঁধ তো এত চওড়াই নয়। তোমার পাশে ওকে দেখলে আমার মনে হয়, আরে ফুঃ! ও কি মানুষ!

তুমি গব গব করে খাচ্ছিল। কচ কচ করে কাঁচা লঙ্কা-পেঁয়াজ ছিঁড়ছিলে। আমায় আবার লঙ্কা আনতে বললে। গোস্তের টুকরো ছোট হয়ে গেছিল।

তুমি জিগ্যেস করলে কে কেটেছে?

খালা বলল, তোর ভাবি!

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে অন্ধকারে হাসলে। বললে, মোল্লাদের এত ছোট ছোট পিস হলি চলে! দাঁতে ছিঁড়তি কষ্ট হবে—তবে না গোস্ খাওয়া।

আমি তোমায় হাওয়া দিতে দিতে লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। দূরে বৃষ্টি পড়ছিল। তুমি বললে, থাক, তোমার কষ্ট হবে। হাতে ব্যথা করবে।

আমি বললাম, না, না। আমার কোনো কষ্ট হইনি। বাতাস করলি এমন কি আর—

তখন তো আমাদের নতুন নতুন ন তলা ছিল আনসার? এখন

পুরনো হয়েছে বলেই কি ছ তলা ? ঐ যে খালা বলে না—'নতুন নতুন ন তলা পুরনো হলেই ছ তলা—'

হাতের ভাত হাতেই থাকে। রহিমা কি যেন এক উচাটনে বন্দী পাখি। তার ঘুম গেছে। দিন গেছে। রাত গেছে। এখন তো শুধু আনসার। আনসার।

রান্নাঘরে খাওয়া মিটে আসে। শীতের রাস্তাটি বড় তাড়াতাড়ি নিঝুম। শুধু দূরে দূরে হ্যালোজেন তার গায়ের হলুদ বর্ণটি নিয়ে জেগে থাকে। তার ওপর কুয়াশার ফিনফিনে মেকআপ।

রহিমা কী ভেবে যেন তাড়াতাড়ি গালে ভাত ঢোকায়।

শ্বশুর বাড়িতেও তো কেউ আমার জোর করে আটকে রাখে না। সোয়ামী ভিসিপি নে মাসের মধ্যে আঠাশ দিন বাইরে। শাশুড়ি বলে, থাক খালার বাড়ি। ছেলেমানুষ বৌ। মন কেমন করে। আমি তাই ভেসে বেড়াই। নিজের আব্বার বাড়ি গিয়ে থাকা যায় না।

রহিমার চোখের জল ভাতের গরাসে মেশে। মৌরলা মাছ-বেগুনের স্বাদ মুছে গিয়ে সেখানে শুধু নুন জেগে থাকে। আনসারকে বাতাস দেয়ার স্মৃতি তার মনকে কোথায় কোথায় যেন টেনে নিয়ে যায়।

চাঁদবিবি রহিমাকে তাড়া দেয়। এঁটো পাড়তে হবে। বাসন গুছিয়ে শোয়া আছে। রাত বাড়ছে। কাল সকাল সকাল ধান ঝাড়ার লোকেরা আসবে। দূরে পুকুর জলে ক্ষয় লাগা চাঁদ তেমনই ভেসে থাকে।

রহিমা চমকে বড় বড় দলা মুখে ফেলতে থাকে, ফেলতেই থাকে। বাসন গুছিয়ে গোটা রান্নাঘর তাকে ন্যাতা দিতে হবে।

কোন ছোট বেলায় সে যেন শুনেছিল, কোনো প্রাচীনা মহিলার মুখে মুখে—'চটায় খায় কটা ?' অর্থাৎ চড়াই পাখি কটাই বা খাবার দানা খেতে পারে ?

হয়ত একসময় এমনই ছিল। কিন্তু এখন দানার হিসেব বড় কঠিন। লোকে এক দানা খাইয়েই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদান চায়। ষোল আনার ওপর আঠার আনা। রহিমাও সেই হিসেবের বাইরে নয়। ধান সেদ্দ, কাপড় কাচা, হাঁড়ি-কড়ার কালি তোলা, মুরগি, গোস্ কাটা, বাজার করা—সে শুধু করেই যায়, করেই যায়—ক্ষয়েই যায়, ক্ষয়েই যায়।

এই ক্ষয়ে যাওয়ার মলম হয়ত আনসার। হয়ত আবিল। শাগিরও কি ? রহিমা জানে না। সে অনেকটা দূর থেকে ভেসে আসা বক্স-

সমৃদ্ধ ফিল্মি হিট শুনতে পায়। গান তাকে জড়িয়ে ধরে। আলিঙ্গনে বাঁধে।

সতের

ব্রহ্মপুরের এই সকালটা অন্য পাঁচ রকম সকাল যেমন—তেমনই। পুনম বেডিং স্টোর্স-এর সামনে তুলো ওড়ে। তুলো ওড়ে। শীতের লেপ-তোষক। উল্টোদিকে তারা ফার্নিচার্স, উমা ফার্নিচার্স-এ বক্সখাট, সানমাইকা বসান হালকা চেয়ার-টেবিল। বিন্ধ্যেশ্বরের তাড়ির দোকানে শীতের নতুন খেজুর রস। ভোরবেলা এক ঝাঁপা নিলে চেনা মানুষকে নটা টাকা দিতে হয়। জয়নগরের মোয়া, খেজুর-পাটালি এসেছে বটতলায়। তা বিক্রির জন্যে কাচের শোকেস-এর গায়ে লাল শালু।

হাজরা মোড় থেকে স্কুটারে ফিরতে ফিরতে আনসার কমলালেবুর উজ্জ্বল খোসাটি এক হাতে ছাড়িয়ে একটুও না টলে ধুলোয় ফেলে দিল। নিজের হাতের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

শীত এখানকার বাতাসকে জড়িয়ে থাকে।

গ্যারেজে পেঁছে আনসার দেখতে পায় তখনও তার মিস্তিরিরা আসে নি। বাবুয়া, দিলীপ, ফরিদ হাজির। গাড়িরা তেমনই দাঁড়িয়ে। যুব কল্যাণ সমিতির দরজা বন্ধ, সেখানে তালা।

রহিমা ততক্ষণে উঠোন, গোয়াল ঝাঁট দিয়ে চা খেয়ে ফেলেছে। বাড়ির দাওয়ায় বসে পুকুরটি চোখে পড়ে। এই শীত-সকালে চুপ একেবারে। হয়ত হাওয়া উঠলে কেঁপে যায়। বাঁশের পাতা, নারকেল পাতায় কাঁপন লাগে। তারাও তো জল ছুঁয়ে। রহিমার শীত লাগে। তবুও সে জলে যেতে চায়।

চায়ের কাপটি অন্যমনস্কতায় একটু যেন ঠক্ করেই মাটির দাওয়ায় নামিয়ে রেখে নিজেই চমকে ওঠে। তার চমকানিটি চাঁদবিবির চোখ এড়ায় না। আজকাল আনমনে সে এরকম ভাবেই মাঝে মাঝে চমকায়। রেহনাবিবির সামনে। রোকেয়াবিবির সামনে। তার ভেতর যেন বাজ পড়ে। আর সে এক দুঃখী, একা, পাতাবিহীন তালগাছ হয়ে দাউ দাউ পোড়ে।

'আছে গোরু না বয় হাল / তার দুঃখ চিরকাল'—এমন উচ্চারণ তো রহিমা বহুবার শুনেছে। আমার আকিল থেকেও নেই। আনসারও তো দূরের নদী। রহিমা আনসারের নামেই যেন নিজেকে নিজে গুছিয়ে নিল। হয়ত পুকুর, এই রোদ, বাঁশপাতার কাঁপন, উঠোনের শালিক তাকে ডেকেছিল। কিংবা চাঁদবিবির গাভিন ছাগলটি, প্রথম সন্তান বহনের ঝুঁকিটি নিয়ে সেও তো ফ্যানে ছিল। মুখ ডুবিয়ে খাদ্যে, সোয়াস্তিতে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চাইছিল। রহিমা নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইছিল।

রেহনাবিবির তাড়া ছিল সকালে অন্জুমানকে স্কুলে পাঠানর। আনসারও অফিস যাবে। রোকেয়াবিবির হাঁটুর ব্যথা কয়েকদিন হলো বেড়েছে। মুরগি-বাচ্চারা পাখায় রঙে ওজনে প্রায় সাবালক হয়ে উঠল। আর একটু বড় হলে হয়ত বড় মেয়ে তিনটে নেবে। ছোট মেয়ে দুটো বা তিনটে। এমন ভাবনায় রোকেয়াবিবি থাকে। যেমন আগে, আগে নিয়েছে।

এখনও রহিমা একা একা কী যেন ভাবছিল। তার শ্বাস পতনে কিছু চাপা দেয়ার আয়োজন ছিল। তবু নিশ্বাস তো বুক ভাঙেই। যে নিজের ভেতর নিজেই নদীর পাড় ভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

বাঁশের ছায়া থেকে আরও গভীরে উড়ে গেল কোনো ঘুঘু পাখি। রহিমা দেখতে পেল না। শাগিরের বোন জামিলা উল-কাঁটায় ছিল। তেমন বুনতে পারে না। তবু হাত চলে। ক্লাস সেভেনের পর পড়া এগোয় নি। এখন 'দিন ধরা' পেরিয়ে বিয়ে বসলেই হলো। সবাইকেই কিছু না কিছু করতে হয়। জামিলাও করে। আসলে তার আব্বা আছে, আম্মা আছে। বাড়ির সবাই লায়েক, কাবিল। তাই শক্ত কাজ করলেও হয়। না করলেও হয়। চিত্রমালা, চিত্রহার, রবিবার সকালের রঙ্গোলি দেখে দেখে তার দিন একরকম ভাবে যেন গড়িয়েই যায় আর রহিমার মনে হয়, দিন ফুরোয়, কই কাজ তো ফুরোয় না!

জামিলা কি একটা কথা বলবে বলবে করে ঘুর ঘুর করছিল। রহিমা শুনতে চাইছিল না। পুকুরে নাইতে গেলে স্নানে কিছু পরচর্চা থাকেই। জামিলা তা গা-মাজতে মাজতে হয়ত আনসারকে নিয়েই আড়োভিড়ে কোনো ঠাট্টা করে বসে এবং আকিলকে নিয়ে সরাসরি।—ঢিটে গোরুটারে পানিতে নামাতি পারিস না! জামিলা মুখ দিয়ে পুচ

করে জল ছুঁড়ে পুকুর জলে মিশিয়ে দিতে দিতে এমনটি বলতে পারে।

রহিমা আকিল নামের ঢিটে গোরুটির জন্যে জল হয়ে যেতে পারে না। বাঁশগাছের ছায়া এই সূর্যের আলোয়, তার নিজস্ব অন্ধকারে হয়ত কোনো চীনা ছবি। তার গভীর থেকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসে শালিক। শীতে ঐ ছায়াতেই নরম রোদ পুইয়ে নিতে পারে ফেউটি নামের পাঅলা, বুকে হাঁটা সরীসৃপটি। তার পাঁচ ছ ইঞ্চি লম্বা শরীরের উজ্জ্বল চামড়ায় শীতের চিকন রোদ্দুর পিছলে যায়।

ফেউটি কালো পিঁপড়ের সারির প্রতীক্ষায় থাকে। হয়ত ছোট পোকার। হঠাৎ দেখলে শিরশির করে গা। রহিমা চোখ সরিয়ে নেয়। জামিলা দেখতে পেলে ওদিকে জল ছুঁড়বে।

সকলেরই কোনো না কোনো প্রতীক্ষায় থাকে। রহিমার তো তেমন কিছু নেই। নাকি আছে? হয়ত ছিল এক সময়। আরও দূরে, সর্দার পাড়া পেরিয়ে গেলে ধান ক্ষেতের ফাঁকা মাঠে শীতের পাখি নেমেছে। জলায় বক। রহিমাদের ছোটবেলায় এদিকেও পাখি আসত। এখন আসে না। সেখানে বন্দুক হাতে পাখি-মারাদের কেউ। আনসারও কখনও কখনও গ্যারেজে কাজ কম থাকলে তার মামা এরশাদের এয়ারগান হাতে নিয়ে পাখি শিকারে যায়।

বুকে আঁচল জড়িয়ে, তার ওপর গামছা টেনে এনে জামিলা ডুব দেয়। একটা দুটো তিনটে। তার শ্যামলা হাতের হলুদ রঙা চুড়ি থেকে বিন্দু বিন্দু জল নেমে আসে। জামিলা আবার ডুব দেয়। ভেসে উঠে সাঁতার কাটে। তার গামছা-শাড়ি ঢাকা আব্রুময় পিঠে শীতের রোদের চোর-পুলিশ খেলা। জলে ভেসে ফেঁপে ওঠে গায়ের গামছা, হাওয়ায় ফোলে।

এসবই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে নিতে পারে রহিমা। উঠোনে ধান ঝাড়ার হালকা হালকা শব্দ। খড়ের গাদা দেয়া চুড়োয় আয়েসী বেড়াল। শীতের রাতে কয়লার গাদায় শোয়া কুকুরের গায়ে এখনও কালচে দাগ। কোনো কোনো বেড়ালের গায়েও কয়লা, অথবা ছাইয়ের রং। শীতের রাত কাটিয়েছে কোথায় তার চিহ্ন।

কুকুরও রোদ খোঁজে। বাচ্চারা খেলা করে উঠানে। হাতে বোনা দড়ির দোলনাটি দুলে ওঠে কোনো ঘুমন্ত খোকা বা খুকির জন্যে। চোখে-কপালে ধ্যাবড়া করে কাজল-টিপ। আঙুল দিয়ে কাজল ফোটা,

দেয়া কপালের একপাশে। মুখে দুধের গন্ধ। গায়ে তেলের বাস।

একটা চিঠিও যদি লিখতে পারতাম আনসারকে। বাংলা ভালো পড়তি পারি না। ঠিক মতো লিখতি পারি না। একেবারে আনপড়ই প্রায়। তাহলি হয়ত আনসার আমারে বুঝত। সব কথা কি মুখি বলা যায়!

জমিলারে দিয়ে চিঠি লেখালে ও সারা পাড়া ফ্যাচাবে—জানাজানি হবে। আমারে কেউ ঘরে রাখবে না। এখনই মাঝে মাঝে চাঁদবিবি সন্দেহ করে। রহিমার পায়ের কাছে শালিক ঘুরে যায়। তার হুঁশ থাকে না। অনেক, অনেক কাজ পড়ে আছে হাতের। শালিক—একটি দুটি তিনটি শালিক জোড় পায়ে তার কাছে নেচে আসে। আবার সরে যায়।

হাঁসের পিঠের সাদাটে লম্বা পালক পড়ে থাকে পুকুর পাড়ে। তাদের ডানায় সকালের রোদ কোনো অনুপম চিত্রমালা নিয়েই পড়ে আছে। রহিমা নিজের অজানতেই যেন পায়ে পায়ে পুকুর পাড়ে এসে নিচু হয়ে হংস-পাখাটি কুড়িয়ে নেয়। তারপর পাকিয়ে কানের ভেতর দিয়ে দু বার ঘুরিয়ে নিতে পারে। তার গোটা শরীর ঘিরে রোমাঞ্চ আসে। আরামে, মুখ সামান্য হাঁ হয়ে যায়। এভাবেই আরও একটি দিন দুপুরের দিকে গড়িয়ে যেতে থাকে।

মুরগির গলা যেন বা এমন শব্দ তুলে তুলে চাঁদবিবি তার নিজস্ব মুরগিদের ডাকতে থাকে। একবার দুবার তিনবার। মুরগিরা ছুটে আসতে চায়।

একটা উঠোন আর একটা গ্রিলের গেট পেরলেই দেখা যাবে দুপুরে স্নান-ধানের পর কোরাণ শরিফ নিয়ে পড়তে বসেছেন রোকেয়াবিবি। কাঠে তৈরি কেতাব রাখার জায়গাটি গুছিয়ে নিয়ে, চোখে চশমা। রেহনাবিবি অনজুমানকে স্কুলের জন্যে তৈরি করে দিতে পেরেছে অনেক আগেই। তার হাতেও অনেক কাজ।

আঠের

ঠিক সন্ধের মুখে মুখে জানা গেল রহিমা ব্রহ্মপুর থেকে চলে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ তখনও উঠে আসে নি। খবর মুখে মুখে ছড়ায়। নিজের বাসা-ঘরে ফিরে সেন্টু শেখ তার মরশিয়া গানের খাতার পাতার ধুলো ঝাড়ছিল—

আমি যার কাছে যায় শুধু পানি আমি চায়
পানির বদলে আমায় তীর মারে হায়

আমি কি করি উপায় শুধু পানি আমি চায়
পানির বদলে আমায় তীর মারে হায়

আমি নদীর কূলে যায় দূর হতে শোনা যায়
চারিদিকে দুশমন ঘিরে পানির উপায় নাই

হোসেনের দুলদুল ছিল হায়
দুলদুল বাড়ি এলো হায়
খালি পিঠে এলি দুলদুল
হোসেন কই আমার ! হায়

দুলদুল কী হইল হায়
দুলদুল আমার কাছে ফিরে আয়
খালি পিঠে দুলদুল দেখে মা ফতেমা করে হায়

মাগো শুনো বলি নাই আমি এলাম কেমনে হায়
খালি পিঠে এলাম কারবালায়
হোসেন বেঁচে নাই

তখুন মা ফতেমা কয় আমার কি হলো
হায় হায়রে আল্লা একটু ভক্তি তোমার দয়া নাই

খোদা হোসেনকে বাঁচাও মিনতি করি হায়
তুমি ছাড়া হোসেনের আর কেহ নাই আমি যায়

খোদ কাশিয়াডাঙা বাড়ি সকলকে সালাম করি
ভুল হইলে মার্জনা করিবেন—আমি যার কাছে যাই

ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সেন্টুর চোখে জল এলো। এই গান গেয়ে আনসারের কাছে থাপ্পড় খেয়েছিলাম। কিছু করতে পারি নি। গান গাওয়া নাকি সেরেক্! না জায়েজি। কতদিন বাড়ি যাওয়া হয় না। পৃথিবীতে এখন শীত। এই তো শেয়ালদা থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে উঠলেই বাড়ি পেঁছে যাওয়া। তবু ছাড়া পাওয়া যায় না। পেটের ধান্দা। খালি কাজ আর কাজ। গাঁথনি, পাঁচিল, মশলার ভাগ, ওলন, পাটা, বাসুলি, কর্নিক, ইট-সিমেন্ট, চুন-সুরকি, জীবন যেন জেরবার হয়ে গেল।

নিজেদের মধ্যে কথা বললে শব্দের শেষ অক্ষরটির ওপর জোর দেয় সেন্টুরা। তাতে কেমন যেন ছন্দ ফোটে। এখানে বলার লোক কম। এসব ভাবতে ভাবতে ভুল বানানে লেখা গানের খাতাটি ধুলো ঝেড়ে ঠিক মতো গুছিয়ে রাখছিল সেন্টু। আরবি সনের প্রথম মাসটি এলে আবার তো গান আছে। তবে এবার আর ব্রহ্মপুরে তেমন ঝামেলা নয়। দরকার হলেঃপাটুলির দিকে চলে যাব। সেখানে মুর্শিদাবাদ থেকে আসা শিয়া বেশি। সেখানে গান শোনাব।

আনসার কিংবা শাগির কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না রহিমা একা চলে গেছে। কিছুই তো সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার মতো ছিল না। খান তিনেক শাড়ি, সায়া-ব্লাউজ, দু এক পাতা বিন্দি, কাচের চুড়ি, সাজার জিনিস।

একই অ্যাজবেস্টসের ছাদের নিচে আমি আর সেন্টু শেখ থাকি। খালি মাঝখানে তিন ইঞ্চি দেয়াল। ভিজে, ড্যাম্প ওঠা মেঝেয় গাড়ি সারানোর নানা হাবিজাবি, বাতিল সিট। কখনও কখনও কোটেশন, বিল ভাউচারের ফাইলও। ঘরে ধূপ জ্বলে, বক্স বসানো ক্যাসেট প্লেয়ারে গান বাজে, তবু মনে হয়, আমার যেন সব ফাঁকা। আকিল যদি রহিমাকে ছাড়ত, তাহলে আমি ওকে নিতাম—এতো মিথ্যে যুক্তি।

নিজের সঙ্গে ছলনা। এসব ভাবতে ভাবতে আনসার সেন্টুর ঘরের দিকে তাকাতে চাইল। সেখানে তো দেয়ালই শুধু। দরজা দেখতে হলে বেরিয়ে দাঁড়াতে হবে।

খবরটা আমায় প্রথম দেয় মামি—রেহনাবিবি। —ভাগনা জানো, রহিমা না—আনসার মামা বাড়ি জামা আনতে গেছিল।

এনামটি শুনেই আনসারের বুক ভেঙে যায়। কি এক কষ্ট উঠে আসে—এরই নাম ভালোবাসা! আমি আর রহিমার নাম শুনতে চাই না।

মামি ফিসফিসে গলায় আরও ঘনিষ্ঠ হতে চায়। এমন উচ্চারণে, যেন কোনো রত্ন-গুহার রহস্য ফাঁস হচ্ছে।

রহিমা পালিয়েছে। ওকে বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন কথায় আনসার ভেতরে ভেতরে কেঁপে ওঠে। আর রেহনাবিবি-ই বা কেন বেছে বেছে তাকেই খবরটি দেয়, সেই জটিল হিসেবের মার-প্যাঁচের মধ্যে গড়িয়ে পড়তে পড়তে আনসার টের পায় তার পাঁজর ভেঙে যাচ্ছে। একি রাগে, একি ভালোবাসায়, একি অধিকার বোধ হারানোর জ্বালায়? পুরুষ বোধহয় এত বোঝে না। তবু তো নারীতে তার যাওয়া। আর ভালোবাসার জটিল ছকে, ঘূর্ণীতে হাবুডুবু খেতে খেতে কখনও ভেসে ওঠা শুধু।

আনসারের মুখের ভূগোল তেমন বদলায় না। তবে হালছাড়া গলায়—গলার স্বর সে তেমন করে বুঝতে দিতে চায় না—মামি কেন আমায় এ খবরটি দিচ্ছে—এমন জিজ্ঞাসাও নিজের ভেতর ঝুলিয়ে আনসার বলে উঠতে পারে, আকিল নিয়ে যায় নি তো! খিদিরপুরে ওদের বাড়িতে খোঁজ নেয়া হয়েছে! কোথায় যাবে!

রেহনা আনসারের মুখ দেখে। সেই মানচিত্রে কোনো দুঃখ-সুখের ঢেউ ওঠে কিনা দেখতে চায়। আনসারের ভেতর ভাঙছিল, মুখে কিছু বলার ছিল না। এমন কি কোনো কাঁপনও না।

রহিমা যে এভাবে যাবে আমি তো ভাবি নি। দূর-আত্মীয়ের উঠোন, গোয়াল ঝাঁট দিয়ে, আপমানের ভাত নীরবে হজম করে, অন্যের ঠাট্টা-ঠিসেরা, কৌতূহল, গা-টেপাটেপি মুখ বুজে মেনে মাসের পর মাস থাকা। এমন কি দিনের পর দিন নিজের জেগে থাকা শরীরকে পোষ মানিয়ে, দরকারে আঘাটার জল খেয়ে, স্বামী নামক জড়পিণ্ডের ঘর

বাঁধার মিথ্যে আশ্বাসে ক্রমাগত অপমানিত হতে হতে রহিমা তো কবেই যেন শেষ হয়ে গেছিল। হয়ত নড়াচড়ায়, ব্যবহারে তার ছায়াটি ছিল। শুধুই ছায়া।

কী ভাবছ ভাগ্না—রেহনাবিবির ডাকে চমকে উঠল আনসার।—নাহ্, কিছু না। গ্যারেজে এখন অনেক কাজ। পার্টিদের কাজ ঠিক মতো দিতে না পারলে পেমেন্ট আটকে যাব, গাল খাব। মিস্তিরি, হেলপারদের টাকা আটকে যাবে। আজ রং-মিস্তিরি আসে তো বডি-মিস্তিরি আসে না। বডির লোক আসে তো রঙের লোক কামাই। আর পারছি না মামি। ভাবছি সব ছেড়েছুড়ে আক্রামকে বুঝিয়ে দিয়ে দূরে কোথাও পালাই।

ওতে ঘোড়ার কচু হবে। মন দিয়ে কাজ করো। নাইলে তো তোমারই ক্ষতি।

রেহনা আনসারের মুখের ভাষা পড়তে চাইছিল। আনসার রেহনার। আনসারের কি চোখের কোণ জ্বালা করছিল? সে মাটিতে চোখ নামিয়ে নিল।

আমায় একবার গড়িয়া যেতে হবে, দুম করে কিছু একটা বলে আনসার রেহনার সামনে থেকে সরে যেতে চাইছিল। মসজিদে ততক্ষণে মগরেবের আজানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। দুপুরে তাসের যে ভরপুর আড্ডাটি বসেছিল বাদামতলায়, রোজকার মতো, এই সন্ধ্যায় তা আবার নতুন করে জমে উঠতে চাইছিল।

আনসার তার প্যান্ট নেয়ার কথাটি বেমালুম ভুলে গেল।

উনিশ

ব্রহ্মপুর বাদামতলায় মুন্ডু তোলা নতুন বাড়িগুলোর মাথায় খুব বেলফুল ফুটেছে। শাদা শাদা, ডবল থাক। ম-ম গন্ধে বাতাস পাগল। সব গাড়ির মাথায় ফুল-বাহার, সেখান থেকে সুগন্ধ। এত সুঘ্রাণ যে মাথার মধ্যে ঢুকে নড়াচড়া শুরু করে দেয়। ভাঙা ডিজেল জিপ, অ্যামবাসাডার, বোর্ড অফিস, ওয়ারলেস-এর গাড়ি, সব ফুলময়—কিংবা তারা প্রত্যেকেই এক একটি ফুল। ফুলেরা আনসারকে ডাকে। বরদা-

প্রসাদ স্কুলের হেড-মাস্টার মশাই ট্রাফিক কনট্রোল করছেন। ফুল-গাড়িরা ফুল-বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। ড্রাইভিং সিটে রহিমা। খুব পাতলা কালো কাপড়ে তার ফর্সা মুখ, ঢাকে কি ঢাকে না। রহিমার চোখে আগুন, জল।

ওকি রহিমা! তুমি গাড়ি চালাচ্ছ কী করে! তোমার তো ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই। অ্যাকসিডেন্ট হবে। ট্রাফিক ধরবে। তুমি তো লাল রঙে ইংরেজি 'এল' লেখা প্লেট লাগিয়ে মোটর ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিং নাওনি। বিপদ হয়ে যাবে রহিমা—কেয়ামতের দিন চলে আসবে।

ফুল-গাড়ির ভেতর, তার সবটুকুই বেলফুলের, এমন কি চাকা, রেডিয়েটর, কারবোরেটর, ব্রেক, ক্লাচ, গিয়ার-বক্স, গিয়ার, স্টিয়ারিং, ব্রেক—সব ফুলের।

আমি আমার পায়ের গয়না খুঁজছি। হারিয়ে গেছে।

গাড়িতে কেন রহিমা! পারবে না। ভিড়িয়ে দেবে। কেস-খামারি হবে। লাল বাজার ট্রাফিক। ডি সি ট্রাফিক। মোটর ভেহিকেল্‌স। তোমার তো লাইসেন্স নেই রহিমা। দাঁড়াও। দাঁড়িয়ে যাও।

বলতে বলতে আনসারের বুকের ওপর বেলফুলের তৈরি চাকা উঠে এলো।

আমি আর পারছিনা রহিমা। দম ফেটে যাচ্ছে। মরে যাব। আমার জানাজা-নামাজ, কুল-পড়ায়, তখন তুমি—

আমার যে পায়ের গয়না হারিয়েছে।

আমি খুঁজে দিচ্ছি। আমায় একটা আলো দাও। বুক থেকে চাকা নামাও রহিমা।

আর তখনই চাকা-চাপা বুকের ব্যথায় ঘাড় সামান্য উঁচু করে আনসার দেখতে পেল—গাড়ির মাথায় নতুন কেনা ভিডিওকন-ভিসিপি-তে ছবি দেখাচ্ছে আকিল।—আসুন আসুন, এক টাকার টিকিটে থ্রি-এক্স হট ছবি। ফুল হয়ে গেলে পাওয়া যাবে না। একটাই শো।

বুকে ওপর চাকার চাপ বাড়ছে।

আমি পিষে যাব রহিমা!

আমার তো পায়ের গয়না পাওয়া যায় নি।

আসুন, আসুন—আকিল লোক ডাকছিল। আর সে দিকে তাকিয়ে ভিসিপি-র পর্দায় নিজেকে ফুটে উঠতে দেখল আনসার—সে, শাগির এবং

রহিমা। সেই নানাদের উঠোনে, উঠোনে অন্ধকার ধোয়া জ্যোৎস্না। একটু নিচের দিকে ঝুঁকে, নিজের শরীরকে আরও স্পষ্ট করে, হারিকেন হাতে কি যেন খুঁজছে রহিমা।

আমি রহিমার হাত ধরলাম। হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে। শাগির দৌড়ে এলো। সে জিভ দিয়ে ঐ রক্ত চেটে নিচ্ছে। সারা শরীর দিয়ে রক্ত পড়ছে রহিমার। আমি—আনসার আলি মন্ডল আর শাগির—আমরা দুজনে মিলে রহিমাবিবির হাত-পা-বুক-পেট সব টেনে টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছি—নিজেদের ভাগে ভাগে। লাল রঙে ডুবে যাচ্ছে পর্দা।

আমরা তিন জনই ডুবে যাচ্ছি। আমি-শাগির-রহিমা। সরু, অন্ধকার, কাঁটা বেছানো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মুন লাইট চিটফান্ডের ডেইলি পেমেন্ট নেয়ার এজেন্ট। তার হাতে নীল বই। ব্রহ্মপুর, বাদামতলা —বটতলার সবাই, মাছঅলা, দোকানদার, গ্যারেজ মালিক, তরকারিঅলা তার কাছে রোজের রোজ টাকা জমা দেয়। পাঁচ বছর পর ১৮% হারে সুদ সমেত টাকা ফেরত পাবে—এমন প্রতিশ্রুতি। সেই মুনলাইট চিট ফান্ড-এর এজেন্টকে ধরার জন্যে সবাই ছুটছে।

ডুবে যাওয়া আনসার আলি মন্ডলের বুকের ওপর রহিমা বিবির চাকা বসে যাচ্ছে—আকিলের ভিডিও প্রোগ্রাম তখনও শেষ হয় নি। সে গোটা ছবিটাই রিবাইন্ড করে নতুন করে আবার দেখাতে শুরু করেছে। অনেক, অনেক টাকা। উড়ছে। উড়ছে। সব ধরতে পারছে না আকিল। কিছু উড়ে রক্তে পড়ছে। ভেসে যাচ্ছে। পাগল হয়ে মাথা চাপড়াচ্ছে আকিল—হায়! হায়! এত টাকা!

এত টাকা দিয়ে কী করবি আকিল!

আরও মেশিন কিনব। হিট হিট কারেন্ট ক্যাসেট রাখব। তা'লে আর কষ্ট করে লাইব্রেরিতে গিয়ে তেল দিতে হবে না। একটা গাড়ি কিনব, বাজাজ-চেতক। একথা বলতে বলতে '—বহুত পেয়ার করতে হ্যায় তুমকো সনম,' এ গানটি আকিল অনায়াসেই গেয়ে উঠতে পারে।

কেয়ামতের দিনে আমার কী হবে রহিমা! আমি তো শুধু জুম্মা-পড়ি। ফজরে দুই রাকাত, জোহরে চার রাকাত, আছরে চার রাকাত, মগরেবে তিন রাকাত, এশার চার রাকাত—কিছুই তো হয় না। শেষ অব্দি জাহান্নামের আগুনে—ওস্তাদজি যে বলেন····।

রহিমা, আমার বুক থেকে গাড়ির চাকা নামাও। আমি থেঁতো

হয়ে গেছি। এটুকু বলেই আনসার চিত থেকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়তে পারে। আর তখনও স্বপ্নের গাঢ় আঠায় নিজেকে জড়িয়ে রাখার এক অস্বস্তিতে তার মনে হয় গাড়ির ফ্যান বেল্ট তার গলায় চেপে বসছে। একটি গাড়ির টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া বডি পার্টস—স্টিয়ারিং, ব্রেক, একসেলেটর, গিয়ার, গিয়ার-বক্স, পেনিয়ান, রেডিয়েটর, কারবোরেটর, ব্যাটারি, ফায়ার প্লাগ—তাকে ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছে। ভিসিপি-র রক্ত ডোবা পর্দার ভেতর থেকে মাথা তুলেও সে বাঁচতে পারছে না। গাড়ি আর গাড়ি—রহিমা—আমাকে শেষ করে ফেলল। এটুকু ভাবতে ভাবতেই সে পুরোপুরি স্বপ্নের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। বিছানায়, তার ঘরে।

গায়ে নানির করে দেয়া ফুলতোলা কাঁথা। চাঁদ-তারা, মসজিদ, ফুল-পাখি-নকশায়—এসবও কট্টর ইসলামী মতে সেরেক্।

আর এই যে রক্ত-পানের স্বপ্ন, রহিমার—সেও তো না-জায়েজ। আনসার এমন ভেবে নিতে পারে। শোয়ার সময় গায়ে পাতলা গেঞ্জি রাখে। আর এখন এই স্বপ্ন-বিভ্রমে গা থেকে চাদর সরিয়ে মেঝেয় রাখা পলিথিনের পানির জগের জন্যে সে হাত বাড়ায়। জগ যদি বা পাওয়া যায়। পানি ভরে রাখা হয়নি। কে আর এখন বাইরে যায়! থাক্, গলা শুকোক।

বাইরে কাঁঠালের পুরু পাতায় জ্যোৎস্না পড়েছে। চাঁদের আলোয় নিমের পাতার এপিঠ ওপিঠের শিরাগুলি বুঝি বা স্পষ্ট চোখে পড়ে। এখন থেকে দেখা যায় না এমন হ্যালোজেনের নিভে আসা হলুদে কুয়াশার ছায়া-বাহার।

ঘুম ভেঙে বিছানায় বসে, নানির করা কাঁথা টেনে গায়ে দিয়ে আনসার জানলা দিয়ে আশ্চর্য জ্যোৎস্না ডোবা পৃথিবী দেখতে থাকল। কোথাও শব্দ জেগে নেই।

এখন রহিমা কোথায় আমি জানি না। ঘুমোতে যাওয়ার আগে শাগির আমার ঘরে, এই বিছানায় বসেছিল। আক্রাম এতক্ষণে মিস্তিরিদের রোজ মিটিয়ে, গ্যারেজের কাজ বুঝিয়ে সাইকেলে কামালগাজি রওনা হয়ে গেছে।

শাগির কিছু একটা বলতে চাইছিল। আনসারও।

আনসার বলতে পারছিল না। কষ্ট হচ্ছিল। শাগিরই প্রথম বলল,

একটু যেন ভয়ে ভয়ে। গলা নামিয়ে—তুই রহিমাকে কোথায় রেখেছিস? তুই সব জানিস।

আল্লার কিরে শাগির। আল্লার কিরে। সেতো আমিও ভাবি, বুঝি তুই

আকিলরা কিন্তু পুলিশে ডায়েরি করবে। তুই আমি কেউ বাদ যাব না। এখনও বল আনসার

বলছি তো শাগির, আল্লার কিরে। তুই বলিস তো কোরাণ শরিফ ছুঁয়ে বলতে পারি, বিশ্বাস কর।

আর কাকে বিশ্বাস করি!

এতক্ষণে ভালো ভাবে বলছি। এবার চড়-থাপ্পড় খাবি, নাকি!

পুলিশ কিন্তু আসবেই আনসার। তুই আমি কেউ বাদ যাব না।

আনসার জানে শাগির তাকে বিশ্বাস করে নি। সেও রহিমার মামলায় শাগিরকে সন্দেহ করছে। কিন্তু সত্যিকারের ব্যাপারটা কি? মেয়েটা কোথায়?

কাঁথা জড়িয়ে খাট থেকে নিচে নেমে, চপ্পল পরে, দরজার খিল খুলে বাইরে আসে আনসার। চারপাশ হিমমেশা চাঁদের আলোয় ভিজে ভিজে। টিউবওয়েল পাম্প করে জগ ভরল। তারপর আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সে তো জল ঢালল শরীরের গভীরে। পলিথিন-বডি টাইটান কোয়ার্জ-এ রাত গড়িয়ে যাচ্ছিল।

কাল ভোরে আবার একগাদা ছুটোছুটি। রহিমা, আজ তো তুমিও নেই। কবে যেন চুল আঁচড়ে দিয়েছিলে—এক বিকেলে। সেই স্মৃতি কেন জানি ভেসে উঠল আনসারের সামনে। তার চোখে অকারণেই জল এলো।

তুমি কোথায় রহিমা? কামালগাজিতে—সেই নিশ্ছিদ্র অপমানের ভেতর, নাকি খিদিরপুরে—বাপের বাড়ির নিত্য অভাবের সংসারে শাকের আঁটি হয়ে? নাকি আরও কোথাও—দূর অন্ধকারে! যেখান থেকে মানুষ আর ফেরে না।

রহিমা তো আমার হয় নি। তবু তারই জন্যে আমার মন কেমন করে কেন? সে কি আকিলের? সে কি শাগিরের? ভাবতে ভাবতে আনসারের গলা আটকে এলো। শুধু তো তার পা মুড়ে বসাটুকু দেখেই একটা বিভোর দিন কেটে যেত নেশায় নেশায়। তারপর সেখানে যদি নূপুর-বাহার থাকত।

ছেলেবেলায় তো তেমন করে মাকে পাইনি। বাবা ব্যস্ত ধর্ম নিয়ে। কবে যেন মাথায় বেড়ে উঠে দেখলাম চারপাশে শুধুই অন্ধকারের ছবি। তখনই তো তুমি এলে। সেও কি আলো নিয়ে!

আমি তো এতসব গুছিয়ে ভাবতে পারিনা রহিমা। তবু আজ রাতে, এই কাঁথার নিচে, শীতে তোমাকে বড় চাইছিলাম। সে কি তোমার শরীর, সে কি তোমার মন? সে কি তোমাকে ঘিরে জেগে থাকা রূপমুগ্ধতার নূর—আলো?

বিছানায় বসা আনসার একা হু হু করে কেঁদে ফেলল। একলা মানুষ অন্ধকারে কেঁদে উঠলে পৃথিবীও ডুকরে ওঠে। আকাশ থেকে নেমে আসা জ্যোৎস্নামাখা হিম বোধহয় সেকথাই বলতে চাইছিল।

কুড়ি

এখনও তেমন করে আলো ফোটেনি। হিমে ভেজা ফুলকপি কাটতে কাটতে শাগির পায়ের হাওয়াই চটিতে জড়িয়ে যাওয়া শিশিরের শীতলতা টের পাচ্ছিল। চাঁদ ডুবেছে একটু আগে। সামান্য পরেই ফজরের আজান শুরু হবে মসজিদে।

লা এলাহা ইল্লালাহু
মহম্মদুর রসুলুল্লা
হাই আলে আসসালা
হাই আল্লেল ফলা

মাইকে সেই আজান-ধ্বনি ছড়িয়ে যাবে অনেক, অনেক দূরে। আমি তো জুম্মাবার ছাড়া মসজিদে যেতে পারিনা। রোজার সময়—ঐ রোজার-ঈদের আগে পাঁচ ওয়াক্ত করি। আজ আমার গাড়ির ডিউটি নেই। এমন ভাবতে ভাবতে শাগির ফুলকপি কাটায় মন দিল। ফুটে ওঠা অফ-হোয়াইট ফুলকপির ওপর জ্যোৎস্নালাগা হিম। এখন পাঁচ টাকা জোড়া। পেঁপে ছাড়া সব সবজিই প্রায় পাঁচ টাকার ওপর। লঙ্কা চোদ্দ/পনের টাকা কিলো। তবে 'পাপোশ' লেগে যাওয়ায় ফুলকপির দর কিছু কম। এবার কিছু 'পাপোশ' লেগেছে।

শাগিরের লুঙ্গি টেনে তুলে হাঁটুর ওপর বাঁধা। যাতে না মাঠের

হিমে বেশি ভেজে। গায়ে সোয়েটার। তার ওপর মাথা বেড় দিয়ে পরা খাদির চাদর। চাদরের পাশ শিশিরে ভিজছিল।

রহিমা তো আমাকে একবারও জানাল না সে চলে যাচ্ছে। অথচ আমি তাকে শাদি করব বলে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এতে আমার আব্বা, মা আমার ওপর চটেছিল। আব্বাকেও তো বলেছিলাম রহিমাকে আমি শাদি করব। ডান হাতে কালো কারে লালচাঁদ-সাপুড়িয়ার মাদুলি—দশটাকা খরচ করে কেনা। আমি তো ভেবেছিলাম আকিল, আনসারকে বাদ দিয়ে রহিমা পুরোপুরি আমার হবে। তা হলো কই!

মাটি থেকে উঠে আসা হিম-ঠাণ্ডা শাগিরকে বিপদে ফেলছিল। তার গায়ের খাদির মোটা চাদর, টেনে, গুটিয়ে শক্ত করে বাঁধা লুঙ্গি ভিজে উঠেছিল প্রাকৃতিক শীতলতায়। মাথায় এখনও হিম লাগছে।

মানুষ জীবনে কতকিছু চায়! পায় কি! এই তো সেদিন গাছ-তলার হাউসিংয়ে একটা 'ওয়াই' গাড়ি নিয়ে কনট্রাকট-এ চালাতে গিয়ে দেখি অনেক ভোরে একটি ফ্ল্যাটের দরজার সামনে বিশাল বিশাল বরফের চাঁই।

শাগির আরও যা যা দেখতে পেয়েছিল, তা এরকম।

বেশ রোদ উঠেছে। ফ্ল্যাটের দরজার সামনে বস্তাবন্দি কাঠের গুঁড়ো, বরফের গোটা তিনেক বড় স্ল্যাব—টুকরো। কাদামাখা একটি, দুটি রজনীগন্ধা। একটি হাত পাঁচ-ছয় লম্বা কাতা-দড়ি, ফ্ল্যাটের সামনে যে চিলতে জমি, সেখানে ঘাস ও সবুজের গা ঘেঁষে। আসলে একজন মানুষ মারা গেছেন গত কাল শেষ রাতে। বয়েস হয়েছিল, তা সত্তর হবে। আজ সারাদিন তাঁর শরীরটি ঘরে রাখা থাকবে। দুই ছেলেই বাইরে! বড়টি মিলিটারি অফিসার। লাদাখের এমন অঞ্চলে পোস্টেড, সেখান থেকে হেলিকপটার ছাড়া আসা যায় না। আর্মি'র নিজস্ব যোগাযোগে খবর দেয়া হয়েছে। সে না আসা পর্যন্ত শরীরে যাতে পচন না ধরে, তার জন্যে এই ব্যবস্থা।

অ্যাবডোমিন—শব্দটা মনে রেখেছে শাগির, সেখানে বেশি করে বরফ-কুচো দেয়ার কথা বলছিলেন কে যেন। বাইরে বরফের চাঙ ভাঙা হচ্ছিল শাবল ঠুকে ঠুকে। আর শাবলের ঘায়ে ছিটকে আসা সেই সব ভাঙা বরফের টুকরো কুড়িয়ে ইট-পাটকেলের মতো ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল ক'জন বাচ্চা। তারা বুঝতেও পারেনি মৃত্যু কত শীতল হয়।

একটু পরে, তখনও তার পার্টি গাড়ি চড়ার জন্যে রেডি হয়নি—শাগির উঁকি দিয়ে, নিতান্ত কৌতূহলেই দেখছিল, একদম সামনে বরফ-শয্যায় একজন দীর্ঘ মানুষ। তবু তাঁর পাটি বরফ-খণ্ড ছাড়িয়ে বাইরে, শূন্যে ঝুলে আছে। শরীরের ওপর একটি লাল নকশা-পাড় শাড়ি, হয়ত তাঁর স্ত্রীরই হবে, হিন্দুদের তো আবার স্বামী মারা গেলেই সব লাল পরা উঠে গেল—তাকে চাপা দিয়ে টুকরো টুকরো বরফ। মানুষ এভাবেও ঘুমে থাকে!

বড়পুত্র আসবে। মুখাগ্নি হবে। সবাই বলছিল।

শাগির আর দাঁড়াতে পারছিল না। সে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে হর্ন বাজিয়ে—যদিও ক্ষণিকের জন্যে তার এও মনে হয়েছিল এই মৃত্যু-স্তব্ধতায় হর্ন বাজানো অসভ্যতা। তব সে বাজিয়েছিল এই হিমায়িত নৈঃশব্দ্যটুকু কাটাতে। জীবনে ফিরতে। শাগির হর্ন বাজিয়েছিল—একবার, দুবার, তিন বার।

রহিমা আমাদের—আমাকে তো এভাবেই নিস্তব্ধ সময়ে রেখে গেছে। কিছু না বলে। আমি তো তাকে ধরে রাখতে পারি নি। কোমর বাঁকিয়ে, নিচু হয়ে কপি কাটতে শাগির আরও কোনো বড় পরিশ্রমে যেতে চাইছিল। দূরে অন্ধকার মুছে গেছে। রাস্তার হলুদ হ্যালোজেন নিভে যাবে আর একটু পরে। পুকুর ঘাটে ক্ষেত থেকে সবে তুলে আনা মুলো ধোয়া হবে। রাস্তায় পড়ে থাকবে কপিপাতা, মুলো শাকের বুড়ো পাতা, দু-এক গাছা পালং। শেখ-পাড়া, যুগীপাড়া, সর্দার পাড়ায় গোরু বাঁধা, ছাগল বাঁধা শুরু হবে। রাস্তায় পড়ে থাকা এইসব পাতা ঘুরে বেড়ান ছাগলদের পেটে যাবে। শেখ-পাড়ার ইন্না, আসমত, সিরাজ, সুজা ঝুড়ি নিয়ে গোবর কুড়োতে বেরবে। নয়ত নর্দমা ছেঁচে তেলাপিয়া, কই, খলসে, উলকো—চ্যাং, ছোট ল্যাটা ধরে রাস্তার চাপা কলে কাদা ধুয়ে মাদার ডেয়ারির প্যাকেটে পুরে বিক্রি করবে। যা হয়।

নয়তো ময়লা ফেলার জায়গা ঘেঁটে ঘেঁটে লোহা, টিন, প্লাস্টিক খুঁজবে। শাঁস তোলা, শুকনো নারকেল মালা, গাছের শুকনো ডাল, এদিক-ওদিক থেকে। শাহবাজের চা-দোকানে কপি, মুলো ডাঁই করে রাখা হবে।

আর এমন ভোরে রহিমা থাকবে না। উঠোন ঝাঁট দেবে না।

ফুলকপির ঝুড়ি মাথায় তুলে নিতে নিতে শাগির দেখতে পেল চার পাশ বেশ ফরসা হয়েছে। আকিল যদি পুলিশের কাছে যায়—থানায় ডায়েরি করে—আমি বল্‌ব, দেব ধরে এক কান চাপাটি। এমন পেটন দেব। বৌ রাখতে পারে না। তাই বৌ পালায়—এতে আমাদের কার কি! কিন্তু আমি যে রহিমাকে শাদি করব বলেছিলাম। আমি যে তাকে—ভাবতে ভাবতে শাগিরের মাথার কপির বোঝা কেঁপে উঠল।

আকিল তেমন করে শাসাতেও পারছিল না। তবে চিৎকার করছিল। একটু জোরেই। বেশ কয়েক দিনই হলো শীত নেমে এসেছে পৃথিবীর মাটিতে।

আমি থানায় যাব। ডায়রি কর্‌ব—যারা আমার রহিমারে

বাড়ির মেয়েরা তাকে শান্ত হতে বলছিল। শাগির বেরিয়েছে গাড়ি নিয়ে। ফিরতে সেই সন্ধে।

তখন আনসার মুর অ্যাভেনিউয়ের বকুলতায় দুঃখী মুখে। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছিল আনসারের। বোধহয় কাল রাতে টিউবওয়েলে পানি ভরতে গিয়ে ঠান্ডা লেগেছে। সে একটু একটু করে মন থেকে রহিমার স্মৃতি মুছে ফেলতে চাইছিল। আসবার সময় পোস্টার দেখেছে মধুবনে 'প্রহার' চলছে। নানা পটেকর, ডিম্পল, মাধুরী দিক্ষিত। নানাকে আমার বেশ লাগে। ওর পারন্দা দেখে—আনসার খৈনির ডিবে বের করে চুনে-তামাকে, নেশায় যেতে চাইছিল। একটু পরে তাকে অফিসার ডাকবে, বিলের ব্যাপারে। বাইরে বসতে বলেছে।

গালের দাড়িতে হাত পড়ল নিজে অজানতে। দিন চার পাঁচ কামানো হয় না। কাল রাতে ঘুমও হয়নি ভালো করে। বড় করে একটা হাই উঠল আনসারের। লোকে যে আমায় দেখলে 'মজনু' বলবে।

নুড়ি পাথরের ওপর ঘষে যাওয়া চাকার ভোঁতা শব্দ আনসারের মাথায় ঢুকে বসে যাচ্ছিল।

একুশ

আজ ৩ ডিসেম্বর। ভোটার লিস্ট-এ নাম তোলার শেষ দিন। নামটা তুলে নাও। কিছু না, একটা রেশন কার্ডের জেরক্স লাগবে আর একটা চল্লিশ পয়সা দামের ফর্ম।

কী হবে আব্বাস! ভোঁটার লিস্টে নাম তুলে আমার চারটে হাত-পা গজাবে! নাকি গাড়ির অর্ডার বেশি পাব। মুসলমানের ছেলের এমনিই চাকরি হবে না। ভোঁট দিলেই বা কি! না দিলেই বা কি! সরকার কার, তোমার-আমার?

না ভাই, ভোঁট দেয়া দরকার। আব্বাস তার পার্টির সাজানো বুলি বলতে চাইছিল।

আজ তেমন করে রোদ ওঠে নি। ঠান্ডাও কম। তবে একটা শির শিরোনি ভাব আছে। রোদ উঠলে আরও ঠান্ডা পড়বে। প্রকৃতি ভিজে মেঘে মোড়া ছিল।

এই তো মালতীবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, সেই যে যেখানে আমাদের বিচার বসেছিল।

আমি চিনি রে বাবা। ওসব আমার দ্বারা হবে না।

আরে দু মিনিটের ব্যাপার, যাব আর আসব। হেডমাস্টারের কাছে ফরম্ আছে। তোমার পয়সাও লাগবে না।

আমি করব নারে বাবা। তুমি যে দেখছি মুনলাইট ইনভেস্ট—চিট ফান্ডের সাগিরুদ্দিনের মতো করছ। যত বলি করাব না বাপু, ততই যেন গায়ে উঠে আসে। বলে ও মামা, পঞ্চাশ, বিশ করতে হবে না। তুমি রোজ বইয়ে পাঁচটা করে টাকা জমা দাও। ১৮% ইন্টারেস্ট এ বাজারে কে দেবে তোমায়? আরে ভারি ঝামেলা তো! ভাবি দি ঘা-কতক। তারপর ভাবি, না, তাহলেই আবার বিচারে বসতি হবে। নেতাদের বড় বড় ভাষণ। এই করো রে তাই করো রে—ধ্যাস, সোগো!

ও মামা! পাঁচটা করে টাকা। রোজ দেবে, বইতে লিখে রাখব। সে যেন ভিখ্ চাইছে। তার নয় কমিশন আছে। তোমার কি আছে আব্বাস!

আব্বাস এই রসিকতাটি সহজ করে নিতে পারে না। তবু তাকে ধৈর্যে থাকতে হয়। এদেশের গণতন্ত্র নামক যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় ভোটার বড় এসেনশিয়াল কমোডিটি। তাকে বোঝা যায় না ইদানীং। একটা সময় পর্যন্ত তোয়াজে রাখতে হয়। তাই মেজাজ খারাপ হলেও আব্বাস ধৈর্য হারাচ্ছিল না। তার চোখের সামনে মালতীবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বড় হলটি ভেসে উঠছিল।

একই ঘরে পার্টিশন ছাড়াই তিনটে ক্লাস। জানলার পেছনে বাঁশ-ঝাড়। একটা ছোট ডোবা। মাথায় অ্যাজবেস্টস। স্কুলে ঢোকার মুখে বড় কালো বোর্ডে শাদা খড়িতে লেখা—'ভোটার তালিকা সংশোধন করা হইতেছে। শেষ তারিখ ৩।১২।৯১'

চলো। চলো। ঐ মাস্টারমশাই-ই সব দেখিয়ে দেবেন। তুমি খালি সই করবে। একটা ভোঁট থাকা দরকার। দাও আর না দাও।

নাহ্ আব্বাস, আমি যাব না। আমার মন ভালো নেই।

আব্বাস সোজা চোখে, হয়ত কিছু সন্দেহ-সংশয় নিয়েও—আনসারের দিকে তাকাল। সে মুখে কোথায় যেন গভীর কষ্ট বিঁধে আছে।

আব্বাস যেন একটু হালকা হবার জন্যেই বলল, থাক। চলো, চা খেয়ে আসি।

বাইশ

দূরে রোদে হেসে ওঠা হলুদ গাছগুলি। এখনও তাদের তুলে নেয়া হয় নি। কদিন পরে মরে শুকিয়ে গেলেই তোলা হবে। তারও পরে জল রঙে আঁকা মুছে আসা ছবি হয়ে দাঁড়ান কলা-ঝোপ। তার আগে সজনে গাছ, কয়েকটি কাঁঠাল, আম গাছ। শীতে সব সবুজ পাতার বুকেই ধুলো। এখান দিয়ে এখন অনেক গাড়ি যায়। তাদের চাকায় চাকায় রাস্তার ধুলো উঠে আসে।

গ্যারেজের অ্যাজবেস্টসের চাল থেকে ঝুলে আছে ঝুলমাখা পালকের ঝাড়ন, টিউবল্যাম্প, ড্রম, ক্ষয়া টায়ার। লালের ওপর শাদায়—স্টিলের অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা 'পুলিশ' শব্দটি। হয়ত ওয়ারলেসের কোনো গাড়ির বাতিল প্লেট।

গ্যারেজে এখন চারটে অ্যামবাসাডার, একটা ডিজেল জিপ, একটা বড় গাড়ি! ঠাসা কাজ। আমি তো কোনো কাজই শেষ করে উঠতে পারছি না। জুম্মায় মসজিদে গেলে দেখতে পাই পাড়ার অনেককে! এদের কেউ কেউ সেই পেটাপেটির পর আমার সঙ্গে একেবারেই কথা বলে না। মুখে মুখে তাকায় না পর্যন্ত। আমি এমন কি দোষ করেছি, যার কোনো ক্ষমা নেই?

এই তো কত পাখি এখনও এইসব গাছের মাথায়। ডানার বিভঙ্গে, শব্দে প্রাণ জাগে। আরও দূরে সর্দার পাড়া পেরিয়ে বোড়ালের দিকে গেলে দূর থেকে উড়ে আসা শীতের হাঁস নেমেছে ধান ক্ষেতে।

এখান থেকে বসে, তাকিয়ে থাকলে চোখে সবুজাভ রোদ পড়ে। কাঁঠাল গাছ, সজনে গাছ, আম গাছ মিলে বেশ একটা চৌকো ছায়াভূমি তৈরি করেছে। সেখানে জিরিয়ে নেয়া যেতে পারে। তারই পরে হলুদ গাছের পাতারা মরণ-প্রতীক্ষায়। প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মেই এই শেষ ক্ষণটি আসবে। তারপর শিকড়ের হলুদ ওপরে উঠে এসে শুকিয়ে মশলা হিসেবে দোকানে যাবে।

এই যে কালকে অনেক রাত অব্দি সাহেবাদের বাড়ি ভিসিপি-তে বি এফ দেখলাম—প্লে অ্যাট বেড—কই! তেমন করে তো কোনো ল্যাজ গজাল না। আমার আজকাল আর কিছুই ভালো লাগে না। গ্যারেজের প্রত্যেকটি গাড়ি যেন এক একটি হাঁ-করা মৃত্যু-গহ্বর। আমি আজকাল ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, রেডিয়েটর, কারবোরেটারের কান্না শুনতে পাই একটু চুপ করে থাকলে।

কার্বাইডে চলা গ্যাস ওয়েল্ডার-এ অ্যাসিটিলিন এক বোতল ঢেলে দিলে নাকি খরচা অনেক কম হয়। ব্যাপারটা করে দেখলে মন্দ হয় না। বড মিস্তিরি বলছিল।

লাল রঙের কার্বাইডে তৈরি গ্যাসের সিলিন্ডার টেনে আনছিল বাবুয়া।

আনসার বলল, আস্তে আন। যেন গায়ে চোট না লাগে।

একটা অ্যামবাসাডারের আড়ালে বসে বাঁশ দিয়ে হাতুড়ির হ্যান্ডেল তৈরি করছিল আব্বাস। চেঁচে সমান করার জন্যে পাশে কাটারি। কী করবে আব্বাস হাতুড়ি দিয়ে—এমন একটা প্রশ্ন আনসারের গলার কাছে এসে আটকে গেল। যাকগে, যে যা ইচ্ছে করুক। ভালো লাগে না।

কাঁঠালের পুরু পাতায় রোদ পড়লে ছাঁকনি গলে এদিক ওদিক বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই সেখানে সবুজ—ঠিক সবুজ নয়, কালচে সবুজ—অথচ তার মধ্যে একটা হলুদ আভা আছে, এমন অন্ধকার জেগে আছে। ঐ অন্ধকার মাঝে মাঝেই আমায় হাতছানি দেয়। কবরের নিচে যে শীতল মরণ-ঘুম, কেয়ামতের দিনে জেগে ওঠার প্রতীক্ষায়—সেও তো আমার স্বপ্নে আছে। তবু এখন, শীতের এই রোদ ছোঁয়া বেলায়, চোখে ঘুম আসে।

অল্প অল্প উত্তরে হাওয়া দিচ্ছে। রোদ লাগা হলুদ গাছের পাতারা কেঁপে উঠছে সেই হাওয়ায়। ওপাশে প্রায় শুকিয়ে এসেছে বন-ধুঁদুল-লতা।

ওরই কোনো খোসায় লাগানো গন্ধ-সাবানের ফেনা রহিমার গায়ে উঠেছিল। শীতলতায়, একটু উষ্ণতার জন্যে যেন বা একটু উষ্ণ হয়ে ওঠার আশ্বাসে আনসার রোদের দিকে মুখ করে বসতে চাইল। তাড়াতাড়ি পালানো, নরম হেলে যাওয়া রোদ—আনসার হয়ত এমনই চেয়েছিল। এরই মধ্যে হালকা হালকা গলায় শোনা যাচ্ছিল, ডিকিটা ঠিক কর, বনেটটা—

সামনের ডালা খুলে, তুলে রাখা ডিজেল জিপের যন্ত্রপাতিরা এই ছায়ায় আলোয় কোনো ছবির মাত্রা হয়ে ফুটেছিল।

আনসার সেদিকে একবার তাকাল।

এই যে এত কাজ, কার জন্যে? অনন্ত বেহস্ত্ অথবা অনন্ত দোজখের হিসেব করে কাটাকুটি, যোগ বিয়োগফল কী হবে আমার জানা নেই। তবু তো খিদে থাকে ঘুম থাকে। রহিমার জন্যে শরীর, মন খারাপ হয়। এসব ভাবতে ভাবতেই আনসার একবার ঘুমে যেতে চাইল। সেই সরল, সুন্দর ঘুমে, যেখানে কোনো ওঠা-পড়া নেই, এমন কি রহিমাও না। তার কষের দাঁতের পাশে, গালে রাখা খৈনির ধকটুকু লালা বেয়ে বড় ধীরে গভীরে যেতে থাকে। আনসার তেমন করে টেরও পায় না। শুধু তার মাথার পাশ দিয়ে অনেক অনেক রঙিন প্রজাপতি হয়ত আবারও মুলো ক্ষেতের দিকে চলে যেতে পারে। তবে কি মুলো ক্ষেতে ফুল এলো? এক সময় এই গোটা ব্রহ্মপুর গ্রামের মুলো ক্ষেত ফুল নিয়ে হেসে ওঠার পর যেন বা আরও রূপবতী হয়ে উঠত বিচিত্র রঙের প্রজাপতির পাখায় পাখায়।

আনসার স্পষ্ট কিছুই বুঝতে পারছিল না। তাকে পেরিয়ে প্রজাপতি-সৌন্দর্য আরও দূরের প্রকৃতিতে চলে যেতে চাইছিল।

সে দিন স্বপ্নে শাগির যে ভাবে রহিমার রক্ত চেটে খাচ্ছিল, আমরা যে ভাবে স্বপ্নে রহিমার হাত-পা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচ্ছিলাম, সবটাই না-জায়েজ। তবু তো আমি দেখি রহিমাকে—স্বপ্নে। শীত রোদ বড় তাড়াতাড়ি পালায়। ছোট বেলার সঙ্গে ছুটে পারা যায় না। ভোটার লিস্টে নাম না তোলায় আব্বাস আমার ওপর একটু যেন চটে আছে। কি রকম কি রকম ব্যবহার, কেমন যেন ছাড়ো ছাড়ো। তবু তো আমায় হেসে কথা বলতে হয়। ঐ পেটাপেটির ঘটনার পর ক্লাবের অনেকেই আমায় পছন্দ করে না। পাড়াতেও তো কতজনের রাগ রয়েছে, সেদিনই তো দেখতে পেলাম। এখন তো পার্টি, নাগরিক কমিটি তবু কিছু ভরসা। তার জন্যে আব্বাস নামের খুঁটিটা আমায় ধরতে হয়। আব্বাসও হয়ত সেটা আন্দাজ করে।

কতদিন হয়ে গেল। রহিমার আজও তো কোনো হদিশ মিলল না। সে কামালগাজিতে নেই। খিদিরপুরে নেই। তাদের অন্য সব আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি নেই। কোথায় যেতে পারে মেয়েটা?

গ্যারেজ থেকে নানা ধরনের সরু মোটা আওয়াজ—হাতুড়ি, লোহা, টিনের প্লেট থেকে ওঠে আসছিল। নিমের ডাল থেকে নেমে আসছিল বুড়ো পাতা শীতের হাওয়ায়। পেছনে খোলা জমির পরে যে কলাঝোপ, সেখানে সিঙ্গাপুরী কলার চওড়া পাতায় কেমন হলুদ রোদ্দুর পড়েছে। পেছনে বাঁশবন, ম্যালেরিয়া-লতা, প্রজাপতি। কাঁঠালের পুরু পাতায় শীতের আলগা ধুলো। বৃষ্টি না নামলে ধুয়ে যাবে না।

পাঁচিলে বসে বসে আনসারের ঘুম আসছিল। যেমন ভাত-ঘুম হয়ে থাকে। রহিমা চলে যাওয়ার পর রাতে কতদিন আমি ভালো করে ঘুমোই না।

এমন ভাবতে ভাবতেই আনসার কখন যেন হালকা ঘুমে জড়িয়ে পড়ল এই দুপুরেই। বেঁকে যাওয়া রোদ পড়েছে তার বাঁ কানের লতিতে। ঘন চুলে সবে স্নানের চিহ্ন। ময়লা মতো গালে দাড়ি আরও বেড়েছে। জামা ঢাকা বুকে শীতের হাওয়া বুড়ো নিমপাতা উড়িয়ে এনে ফেলল। তাতে হয়ত ক্ষণিক রোমাঞ্চ এলো শরীরে।

আনসার দেখছিল ক-অ-বে—আজ থেকে কত্ত বছর আগে, তখনও

তার গ্যারেজ হয় নি, সবজি ঠেক হয় নি, আসে নি মুর্শিদাবাদ, চন্দনেশ্বর, বারুইপুর, ক্যানিংয়ের মানুষ। মসজিদ এত সুন্দর, সাজগোজ করা হয় নি। সবেদার বাগান, পেয়ারা বাগান, আশফল, লিচু, আমের বাগান চারপাশে। আতা গাছ, আনারস-ঝোপ। পুকুর। এখন যেমন নতুন হাট, বোড়াল, নোনাচিয়াড়ি—অনেকটা তেমনটি।

কোনো এক বাড়ির বুড়ো কর্তা মারা গেলেন। এমনই শীতের দুপুর। মেয়েরা কেঁদে উঠল, ওগো! তুমি আমাদের ছেড়ে কোথায় গেলে গো। আমাদের আর কথা বলার কেউ রইল না গো!

খাটে, কালো কাপড়ে ঢাকা জানাজাটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ধীরে।

তখনও পাকা রাস্তা হয় নি। কাবার দিকে মুখ করে জানাজা-নামাজ। সবাই পাক-লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে এসেছে। মাথায় টুপি, নয়ত রুমাল বাঁধা।

এলাকার যত মানুষ—ইসলাম ধর্মাবলম্বী—সকলেই আসছেন জা-নামাজে। ওস্তাদজি পড়াবেন। সুরা বলবেন।

আলো কমে আসছিল।

জানাজাটি ধীরে ধীরে কেব্‌লার দিকে মুখ করে নামিয়ে রাখা হলো।

সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে।

ধীর গম্ভীর শোকার্ত স্বরে সবাই জানাজা-নামাজ পড়ছেন। তারপর মাটি হবে।

এর আগে প্রাচীন মানুষটিকে নিয়ম মতো গোসল করানোর পর কাফনের তিনটি কাপড়ে ঢাকা হয়েছে। কোরতা—এর জেব নেই। বিনা আস্তিনের পিরহান। ঘাড় থেকে পা অব্দি লম্বা। বুকের সামনে খানিকটা খোলা। ইজার—একটুকরো চার কোণা কাপড়, যা দিয়ে কবরে যাওয়া বৃদ্ধের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা হয়েছে। লেফাফা—ইজারের মতোই একখন্ড চার কোণা কাপড়, এদিকে ঢাকা হয়েছে মাথা থেকে পা।

বাঁশ কেটে রাখা হয়েছে আগেই।

জানাজার খাটে লেফাফা বেছান হয়েছে প্রথমে, তার ওপর ইজার। পরে পিরহানের পিঠের দিকে ইজারের ওপর বিছিয়ে বুকের দিকটা উল্টে

মাথার দিকে রাখা হয়েছে। তারপর সেই কর্তা-মানুষটিকে শুইয়ে তার মাথার ভেতর দিয়ে পিরহানের সামনের গুটনো অংশ পরান হয়েছে। এরপর ইজেরকে প্রথমে বাঁ দিকে, পরে ডান দিকে লেপ্টান হয়েছে।

এভাবেই জানাজা-নামাজ শুরু হয়ে যায়—

নাওয়ায়তুআন্ উওয়াদ্দিয়া আরবায়া' তাক্‌বীরাতে ছালাতিল

জানাজাতে ফারদিল কেফাতে আচ্ছানাউ লিল্লাহে তায়া'লা ওয়াচ্ছালাতু

আ'লান্নাবীয়ো ওয়াদ্দুয়া'উ লেহাজাল মাইয়্যেতে মোতাওয়াজ্জেহান্ ইলা জোহাতিল

কা'বাতিশ শারিফাতে আল্লাহো আকবর।

আমি পবিত্র কাবা শরিফের দিকে মুখ করে চারি তক্‌বীরে ফারজে কেকায়া জানাজার নামাজ আদায় করতে নিয়েত করলাম। আল্লাহ-তায়ালার জন্যে প্রশংসা, হজরত রসুলের প্রতি দরুদ এবং মৃত ব্যক্তির প্রতি আশীর্বাদ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

মৃত, প্রাচীন মানুষটির দোষ ত্রুটির জন্যে উপস্থিত সকলের কাছে ক্ষমা চাইছিলেন তাঁরই নিকট আত্মীয়রা।

বেলা পড়ে আসছিল।

আনসার এই ঘুমে, এই ঘুমে নয়—তার সামনে নিভে আসা বেলায়, সেই কবে বালক-বেলায়, নাকি প্রথম কৈশোরে ফেলে আসা জানাজা-নামাজের স্মৃতি-গন্ধটুকু খুঁজে পাচ্ছিল। ফুটে ওঠা সারি সারি টুপি পরা মাথা। শান্ত গম্ভীর।

পেছনে কবর-ভূমিতে মাটি কাটা হয়ে গেছে। যেহেতু পুরুষ, তাই তার গভীরতা নাভি অব্দি। স্ত্রীলোক হলে বুক পর্যন্ত হত।

শীতের শেষ বেলায় তন্দ্রাচ্ছন্ন আনসার একটি পরিচ্ছন্ন, কাঁচা সমাধি-ভূমি দেখতে পাচ্ছিল। যার সামান্য উঁচু, চৌকো মাটির ওপর সবে পুঁতে দেয়া কোনো নবীন খেজুর পাতা, ডালসুদ্ধু। হাওয়ায় দুলছিল কি দুলছিল না।

বাতাস বড় ধীরে বইছিল।